ইস্‌লাম প্রসঙ্গ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

মাওলা ব্রাদার্স ।। ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন · ২৪৯৪৬৩

প্রচ্ছদ
নাসিম আহমেদ

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম রোড, ঢাকা ১১০০

উৎসর্গ

যাহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্নে
বিক্ষিপ্ত বিস্মৃত পত্রিকাসমূহের পত্রান্তরাল
হইতে এই পুস্তক আত্মপ্রকাশ করিল,
সেই পরমকল্যাণীয় প্রাণাধিক
আবুল্ ফযল মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহের
সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায় এই পুস্তক
উৎসর্গীকৃত হইল।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

সূচীপত্র

"দেখ্ কর্ রঙ্গে চমন হো না পরেশাঁ মালী,
কৌকবে গুঞ্চাসে শাখেঁ হাঁয় চমক্‌নেওয়ালী
খস্ ও খাশাক সে হোতা হায় গুলিস্তাঁ খালী,
গুল বর্ আন্দায হায় খুনে শুহাদা কী লালী।
রঙ্গে গর্দুঁ কা যরা দেখ তু 'উন্নাবী হায়,
য়িহ্ নিকলতে হুএ সূরজকী উফক্ তাবী হায়।"

— আল্লামা মুহম্মদ ইক্‌বাল

— মালঞ্চের রং দেখে মালী হ'স নে কো তুই পেরেশান,
হ'ল ব'লে তারার মত কুঁড়িতে ডাল শোভমান।
কাঁটা খোঁচা হ'তে খালি হবে শীঘ্র এই বাগান,
ফুটছে দেখ গোলাপ যেন শহীদ খুনে রং মাখান।
রং মেখেছে আকাশ আজি দেখতে সে যে লাল গোলাপই,
উঠন্ত কি রবির রঙে রাঙিয়ে দেছে খুনখারাপি?

অনুবাদ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : শিক্‌ওয়াহ্ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ্।

কসীদাঃ গওসিয়াঃ

[হযরত বড় পীর (রঃ) সাহেবের রচিত]

পিরীতি আমারে মিলন-মদিরা করায়েছে পান,
বলিনু সাকীরে, "এস মোর কাছে হ'য়ে আগুয়ান।"
আসিল ধাইয়া পাত্র লইয়া মোর কাছে সাকী,
মজিয়া নেশায় সখাদের মাঝে হারাইনু জ্ঞান।
বলিনু তখন সকল কুতবে, "পাও মোর দশা,
আইস অন্দরে, তোমরা আমারি সেবক সমান।"
তাহারা অটল আপন আপন পদের উপর,
আঁধার রাত্রিতে তারার মতন করে জ্যোতি দান।
সাহস বাঁধিয়া পিও এ শরাব, হে আমার সেনা,
আমাদের সাকী ভরেছে পাত্র কানা পরিমাণ।
নেশা শেষে মোর উচ্ছিষ্ট শরাব করিয়াছে পান,
পাও নাই তবু মিলন অথবা মহৎ সম্মান।
তোমাদের পদ যদিও উন্নত, তথাপি জানিও,
তোমাদের হ'তে অনেক উপরে আমার যে স্থান।
শুধু আমি তাঁর নৈকট্য-আসন করিয়াছি লাভ,
ঘুরাইছে মোরে যথেচ্ছা আমারে সেই মহীয়ান্,
পীরের সমাজে আমি হই অতি দ্রুত বাজ পাখী,
মানবের মাঝে কে পেয়েছে দান আমার সমান?
খিলাত পেয়েছি, জ্ঞান চেষ্টা মোর আছিল যেমন,
কামালিয়তের পরিয়াছি তাজ হয়েছি মহান্।
পুরান রহস্য জানায়েছে মোরে সেই দয়াময়,
পূরায়েছে মোর সকল প্রার্থনা, হয়েছি প্রধান।
কুতবগণের উপর আমারে দিয়েছে নেতৃত্ব,
আমার আদেশ সবার উপরে হয় বল্‌বান্।
দরিয়ার মাঝে ফেলি যদি আমি রহস্য আমার,
চিরতরে শুষ্ক হইবে দরিয়া ভূমির সমান।
পাহাড়ের মাঝে ফেলি যদি আমি রহস্য আমার,
চূরমার হ'য়ে মিশে যাবে তারা মাটির সমান।
আগুনের মাঝে ফেলি যদি আমি রহস্য আমার,
মম দশাগুণে হইবে আগুন শীতল পাষাণ।
মৃতের উপর ফেলি যদি আমি রহস্য আমার,
কুদ্‌রতে খোদা হইবে তখনি সে দণ্ডায়মান।
নাহি হেন কাল অথবা এমন নাহি কোন মাস

আসে যায় চ'লে, আসে নাকো যেবা মোর সন্নিধান।
খবর শোনায়, জানায় আমারে যত ভবিষ্যৎ,
থামাও তোমার গণ্ডগোল যদি হও বুদ্ধিমান্।
মুরীদ আমার, কর উৎসাহ মনে হও খুশী,
কর যাহা খুশী, জানিও নামটি আমার মহান্।
মুরীদ আমার, লোকের কথায় ক'রো নাকো ভয়,
রণ মাঝে আমি সেনানী সুদৃঢ় মহাবীর্যবান্।
মুরীদ আমার, ক'রো নাকো ভয়, প্রভু মোর খোদা,
দিয়াছেন মোরে উন্নতি, হয়েছি মহাভাগ্যবান্।
জমি আসমানে বাজিছে আমার বিজয় দামামা,
নসীব আমার হয়েছে চৌদিকে জাজ্জ্বল্যমান্।
খোদার দুনিয়া মুলুক আমার, মোর তাবেদার,
আদি কাল হ'তে ছিল মোর কাল মহাজ্যোতিষ্মান্
মানস-নয়নে খোদার দুনিয়া দেখিনু সকল,
মিলন-আলোকে মনে হ'ল সব অণুর সমান।
আউলিয়া যত আমার কদমে, আর আমি সেই,
কামাল-শশাঙ্ক নবীর কদমে চির সেবমান।
যত বিদ্যাজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া হইনু কুতব,
প্রভুর দয়ায় সৌভাগ্য লভিয়া হনু লাভবান্।
আউলিয়া মাঝে কে আছ কোথায় আমার সমান?
আমার মতন দশান্তরকারী অথবা বিদ্বান্?
ইব্‌ন রুফা'ঈ আমা হ'তে যত পেল মা'রফত,
আমারি শুগলে, আমারি তরীকে আছে বর্ত্তমান।
ইমাম হাসন বংশীয় আমি মুজ'দা মকাম,
সকল লোকের গ্রীবাদেশে মোর চরণ দু'খান।
'আবদুল কাদির জগদ্‌বিখ্যাত নামটি আমার,
দাদা হন মোর কামালের যিনি উৎস সমান।
মুহ্যুদ্‌দীন জীলানী আমার নাম মুবারক,
সকল গিরির চূড়ায় উড্ডীন আমারি নিশান।

প্রথম প্রকাশ : মাহেনও ॥ ৮ম বর্ষ : ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ ॥
অনুবাদ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

ইসলাম ও বিশ্ব-সেবা

সৌর জগতেব প্রতি লক্ষ্য কর, দেখ, গ্রহ-উপগ্রহগুলি কি সুনিযমে কি সুশৃঙ্খলায় তাহাদের নিজ নিজ কক্ষে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীতে দেখ বৃষ্টি হইতেছে, নদী বহিতেছে, ফল পড়িতেছে, ফুল ঝরিতেছে। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ সমস্ত মাধ্যাকর্ষণের ফল। জড়জগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ, মনোজগতেও সেইরূপ এক আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণেব ফলে বন্ধুর প্রীতি, পতি পত্নীর প্রেম, পিতামাতার বাৎসল্য, সন্তানের মাতৃপিতৃ ভক্তি, দাতার দাক্ষিণ্য, সজ্জনের দয়া। কি মধুর আকর্ষণ। একই পদার্থ পাত্রভেদে বিভিন্নরূপ। এই যে প্রাণের সহিত প্রাণের টান— তাহার অফুরন্ত উৎস প্রেমময় আল্লাহ্ তা'আলার অনন্ত করুণা। আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) বলিয়াছেন যে,—

> "আল্লাহ্ তা'আলার শত করুণার মধ্যে একটী মাত্র তিনি দানব, মানব, চতুষ্পদ ও হিংস্রজন্তুকে দান কবিয়াছেন। তাহার ফলে এই সমস্ত প্রাণী পরস্পর দয়া ও অনুগ্রহ করে, তাহার ফলে বন্য পশু তাহার শাবককে ভালবাসে...।"
>
> [হযবত আবু হুবয়বহ (রঃ) হইতে বর্ণিত ; বুখারী ও মুসলিম]।

আর একবার আমাদেব প্রিয় নবী (সঃ) মাতৃবক্ষে শিশুর দিকে লক্ষ্য করিযা বলিয়াছিলেন,—

> "যেমন এই জননী তাহার সন্তানকে স্নেহ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহা অপেক্ষা বেশী তাঁহার সৃষ্ট জীব ('ইবাদ)-কে স্নেহ করেন।"
>
> [হয্‌রত উমর (রঃ) হইতে বর্ণিত, বুঃ ও মুঃ]

আল্লাহ্ তা'আলার করুণা অনন্ত ; তাঁহার দানও অনন্ত।—

> "এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা কর, তোমরা তাহা গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না"।
>
> (কুর্'আন, সূরাহ্, ইব্রাহীম, রুকু, ৫ ; নহল, রুকু, ২)।

ধর্ম দয়াময় আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ দান। সেই ধর্মের উদ্দেশ্য, মানব তাহাব আমিত্বকে আল্লাহ্‌র প্রীতির জন্য বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত জগতে প্রেম ও শান্তির স্বর্গরাজ্য সামান্য কুর্অ বসাইবে। মহানে উক্ত হইয়াছে,—

> "এবং তাহারা বলে কেহ্ কিছুতেই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যদি না সে ইয়াহুদী কিংবা খ্রীষ্টান হয়। ইহা তাহাদের খেয়াল। বল, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। না; যে আপনাব আমিত্বকে (আরবী—মুখকে) আল্লাহ্‌র কাছে সঁপিয়া দেয় ('আং, আস্‌লম) এবং হিতকারী হয়, তাহার পুরস্কার তাহার প্রভুর নিকট আছে, তাহার কোন ভয় নাই, সে শোক পায় না।" (সূরাহ্ বকরাহ্, ১৩ রুকু')।

আমাদের ধর্ম্মগুরুর একটী উক্তি আছে,—

"যাঁহাব হস্তে আমার জীবন তাঁহাব শপথ তোমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত না তোমরা ম'মিন (ধর্মবিশ্বাসী) হইবে; এবং তোমরা ধর্মবিশ্বাসী হইবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পর ভালবাসিবে" ...। [আবু হুরয়রহ (রঃ) হইতে বর্ণিত; মুস্‌লিম]।

সূর্য্য আলো দেয়। চাঁদ কিরণ বিলায়। বাতাস ব্যজন করে। মেঘ বর্ষণ করে। নদী স্বচ্ছ জল বয়। ফুল মধুর গন্ধ ছড়ায়। এই সমস্ত কাহাদের জন্য? সকলই কি সেই করুণাময়ের জীবদের জন্য নয়? এখানে কোন ভেদ নাই; সকলেরই আল্লাহ্‌র দানে সমান অধিকার। প্রেমপ্রীতি যাহা ধর্মের মূল তাহাও সকলের জন্য। কুর্‌'আনের উক্তি—

"নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচার ও উপকার করিতে আদেশ করেন .....।"

(সূরাহ্ নহল্)।

"উপকাব কর যেমন আল্লাহ্ তোমার উপকার করিয়াছেন।"

(সূরহ্ কসস্)।

এই উপকার যাঁহারা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন, তাঁহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার সত্যধর্মের অবমাননা করেন। হয্‌রত পয়গম্বর সাহেবের (সঃ) জীবনী ও উপদেশ কখনই এই সংকীর্ণতার আশ্রয় দেয় না। তিনিই স্বয়ং সমস্ত জগতের জন্য মূর্ত্তিমতী করুণা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"এবং তোমাকে সমস্ত জগতের জন্য করুণাস্বরূপে পাঠাইয়াছি এতদ্ভিন্ন নহে"! (কুর্‌'আন, সূরাহ্ আম্বিয়াঅ)।

এস্থলে হদীস গ্রন্থ হইতে হয্‌রতের কয়েকটী অমৃতবাণী উদ্ধৃত করিতেছি,—

"......মনুষ্যের জন্য তাহা ভালবাসিবে যাহা নিজের জন্য ভালবাস, তবেই মুস্‌লিম হইবে"; "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ তাহাব প্রতি দয়া করেন না।" "সে-ই লোকের মধ্যে ভাল, যে লোকের হিত করে।"

মনুষ্য পর্য্যন্তই দয়ার সীমা নহে। যেমন প্রেমময় খোদার দয়া সকল জীবের জন্য, তেমনই খোদা-ভক্তের দয়া। হয্‌রত বলিয়াছেন,—

"পৃথ্বীবাসীর উপর দয়া কর তবে স্বর্গবাসী (আল্লাহ্) তোমাদের উপর দয়া করিবেন।" "সমুদয় সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিজন, সৃষ্টির মধ্যে সেই আল্লাহ্‌র প্রিয়তম যে তাঁহার এই পরিজনের সর্ব্বাপেক্ষা উপকারক।"

অনেক সময়ে হয্‌রত পয়গম্বর সাহেব অবলা জন্তুদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেও শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন। কখন বা এই সম্পর্কে প্রাচীন উপাখ্যান বর্ণনা করিতেন। তাহার দুইটী এখানে হদীস হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) কোন স্ত্রীলোকের একটী বিড়াল ছিল। সে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিত। সে বিড়ালটীকে কখনও ছাড়িয়া দিত না যে সে পোকা মাকড় ধরিয়া খায় কিংবা নিজেও কিছু খাইতে দিত না। অবশেষে বিড়ালটী মরিয়া গেল। এই জন্য সেই স্ত্রীলোকটী নরকবাসিনী হইল।

(আবদুল্লাহ্ বিন্' উমর হইতে বর্ণিত; বুখারী)।

(২) ইস্রাইল বংশীয় একটী স্ত্রীলোক ব্যভিচারের জন্য গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল। পথিমধ্যে দেখিল একটী কুকুর পিপাসায়

কাতর হইয়া একটী কূপের চারিদিকে ঘুরিতেছে। স্ত্রীলোকটী জুতা খুলিয়া তাহার দ্বারা পানি তুলিয়া কুকুরটীকে খাওয়াইল। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিলেন। (আবু হুরয়রাহ্ হইতে বর্ণিত; বুখারী)।

ন্যায় ও সদয় ব্যবহারে হযরতের নিকট কখনও স্বধর্মী বিধর্মী বিচার ছিল না। তাঁহার পিতৃব্য আবু তালিব ইস্‌লাম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু হযরত সকল সময় তাঁহার সহিত পরম সদ্ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন। একদিনের জন্যও উভয়েব মধ্যে কোন অপ্রীতির সঞ্চার হয় নাই। হযরত বিধর্মী অতিথির মল মূত্র স্বহস্তে ধৌত করিয়াছেন। ইস্‌লামের অতি বড় শত্রুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগ দিয়াছেন। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। অনেক সময় তাঁহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বিধর্মী ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে।

ইতর জন্তু পর্য্যন্ত হযরতের করুণা হইতে বঞ্চিত হইত না! তাহারাও যেন তাঁহাকে তাহাদের দয়ালু বন্ধু বলিয়া চিনিত। একদা হযরত শিষ্যদের সঙ্গে কোনস্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক উট হযরতকে দেখিয়া মাটীতে মুখ দিয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিল। তিনি থামিলেন। পরে উষ্ট্র-স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"এই উট আমার নিকট নালিশ করিতেছে যে, সে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না অথচ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতেছে। দেখ, তুমি ইহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে।" (শরহু স্-সুন্নহ্)।

অন্য এক সময় হযরত একটী বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। একটী হরিণীর ডাকে তাঁহার মনোযোগ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন হরিণীটী বাঁধা রহিয়াছে এবং নিকটে ব্যাধ শুইয়া আছে। হরিণী তাহার শাবকের জন্য কাতরধ্বনি করিতেছে। তিনি হরিণীকে খুলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে হরিণী বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করাইয়া ফিরিয়া আসিল। শিকারী জাগ্রত হইলে হযরত তাহাকে হরিণীটিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সেও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। হরিণী তাহার অব্যক্ত রবে হযরতকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সানন্দ গতিতে চলিয়া গেল। (তিবরানী ও বয়হক্কী)।

একদা তাঁহার এক শিষ্য জঙ্গল হইতে পাখীর বাচ্চা ধরিয়া আনিয়াছিলেন। ধাড়ী পাখিটী শাবকের মায়ায় সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া আসিয়াছিল। শিষ্য হযরতের সম্মুখে বাচ্চাগুলি রাখিয়া দিতেই পক্ষিণী শাবকগুলির উপর আসিয়া পড়িল। সে আর কিছুতেই সরে না। হযরত এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, "পক্ষিমাতার শাবকের প্রতি যত স্নেহ, আল্লাহ্ তা'আলার জীবের প্রতি তাঁহার অধিক স্নেহ; যাও যেখান হইতে এগুলিকে আনিয়াছ রাখিয়া আইস, তাহাদের মাতা তাহাদের সঙ্গে থাকুক।" শিষ্যটী তাহাই করিলেন। (আমির হইতে বর্ণিত; আবু দাউদ)।

বৃক্ষলতার প্রতিও হযরতের সস্নেহ ব্যবহার ছিল। তিনি অকারণে জীবিত বৃক্ষছেদন করিতে নিষেধ করিতেন। মক্কাশরীফের হরমের মধ্যে গাছের পাতা ছেঁড়া পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হযরত পয়গম্বর সাহেব (দঃ) উপাসনা ('ইবাদত) বলিতে কেবল নমায, রোযা প্রভৃতি অনুষ্ঠান বুঝিতেন না, যদিও এইগুলি তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিতেন। মানুষ বিশ্বপতির প্রেমে আত্মপর ভুলিয়া বিশ্বের প্রতি প্রেমযুক্ত হইবে--ইহাই ছিল তাঁহার নিকট অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র বাণী—

"তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে বিচার দিনকে মিথ্যা বলে? সেই জন্য সে অনাথকে তাড়াইয়া দেয় এবং দরিদ্রকে ভোজ্য দানে কাহাকেও প্রবৃত্ত করে না। আপেক্ষ সেই নমাযীদের জন্য যাহারা নমায সম্বন্ধে উদাসীন, যাহারা কেবল লোক দেখায় কিন্তু সামান্য সাহায্যে বিমুখ।" (সূরাহ্ মা 'উন)।

পুনশ্চ ঃ "এবং তাহারা (আল্লাহ্‌র) প্রেমে দরিদ্র, অনাথ ও বন্দীকে ভোজ্য দান করে। (তাহারা বলে) 'আল্লাহ্‌র আনন্দ উদ্দেশ্যেই আমরা তোমাদিগকে ভোজ্য দান করিতেছি। তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা চাহি না।" (সূরহ্ দহর)।

নিম্নলিখিত হদীস হইতে এই বিষয় আরও বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(শেষ বিচার দিনে) আল্লাহ্ তা'আলা (মানবগণকে একে একে ডাকিয়া) বলিবেন, "হে আদমের সন্তান, আমি পীড়িত ছিলাম; তুমি আমার সেবা কর নাই।" সে বলিবে, "হে প্রভো, আমরা কেমনে তোমার সেবা করিতে পাবি? তুমি যে বিশ্বের প্রভু।" তখন আল্লাহ্ বলিবেন "তুমি কি জানিতে না যে আমার অমুক দাস পীড়িত ছিল? কিন্তু তুমি তার সেবা কর নাই। তুমি কি জানিতে না যে যদি তুমি তাহার সেবা করিতে, তাহার নিকট আমাকে পাইতে?" পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, "হে আদমের সন্তান, আমি তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে অন্ন দাও নাই।" সে বলিবে, "প্রভো, আমি কিরূপে তোমাকে অন্নদান করিতে পারি? তুমি যে বিশ্বের প্রভু।" তখন আল্লাহ্ বলিবেন, "তুমি কি জানিতে না যে আমার অমুক দাস তোমার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়াছিল? কিন্তু তুমি তাহাকে অন্নদান কর নাই। তুমি কি জানিতে না যে যদি তুমি তাহাকে অন্ন দিতে, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট পাইতে?" পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, "হে আদমের সন্তান, আমি তোমার নিকট পানি প্রার্থনা করিয়াছিলাম; তুমি আমাকে পানি দাও নাই।" সে বলিবে, "হে প্রভো, আমি কিরূপে তোমাকে পানি দান করিতে পারি? তুমি যে বিশ্বের প্রভু।" তখন আল্লাহ্ বলিবেন, "তুমি জানিতে আমার অমুক দাস তোমার নিকট পানি প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু তুমি তাহাকে পানি দান কর নাই। তুমি কি জানিতে না যে, যদি তুমি তাহাকে পানি দিতে তাহা হইলে তাহা আমাব নিকট পাইতে?" (আবু হুরয়রহ্ হইতে বর্ণিত; মুস্‌লিম)।

মুসলমান! তোমার আল্লাহের প্রেম অর্থহীন, যদি না বিশ্বের দুঃখে তুমি দুঃখী হও, যদি না বিশ্বের সুখে তুমি সুখী হও! তোমার আল্লাহ্‌র সেবা নিরর্থক, যদি না বিশ্বের সেবায় তুমি ব্রতী হও। কথিত আছে মজনু কুকুরেব পদ চুম্বন করিয়াছিলেন। লোকে বলিল, "এ কি ব্যাপার?" মজনু বলিলেন, "এ যে লায়লার গলি দিয়া যাতায়াত করে।"

"পায়ে সগ বুসীদ মজনু খল্‌ক্ গোফ্‌ত ঈঁ চে বূদ।
গোফ্‌ত ঈঁ সগ গাহে গাহে কূরে লয়লা রফ্‌তহ বুদ ॥"

তুমি দাবী কর আল্লাহর প্রেম, আর আল্লাহ্‌র জীবের প্রতি তোমার প্রেম নাই! এ কি সম্ভব?

প্রথম প্রকাশ ঃ "মোয়াজ্জিন" ॥ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩৫ ॥

ইস্‌লামে নারীর ধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকার

অনন্ত জীবন লইয়াই ধর্ম। কাজেই ধর্মের অধিকার মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার। এই অধিকার হইতে যে চ্যুত, তাহার মত শোচনীয় হতভাগ্য জীব জগতে আর কে আছে? খোদার আলোয়, জলে ও বাতাসে সকল মানুষের, সকল স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। তেমনি ধর্ম যদি খোদার হয়, তবে তাহাতেও সকলের সমান অধিকার থাকিবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সকল দেশে সকল সময় এ অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। পুরুষরা কেবল পার্থিব ব্যাপারেই তাহাদের একচেটিয়া অধিকার দাবী করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ধর্মকেও তাহাদের একচেটিয়া ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছিল। ভারতে বৈদিক যুগের পরে নারীগণ ধর্মের অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। স্মৃতিকারেরা বলিলেন, নারী ও শূদ্রের বেদ শোনার পর্যন্ত অধিকার নাই। ইউরোপে মধ্যযুগে নারীর আত্মা আছে কি না এই লইয়া প্রবল মতভেদ ও কলহের সৃষ্টি হয়। ইসলাম অন্যান্য বৈষম্যের ন্যায় নরনারীর ধর্মেব বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তীক্ষ্ণ খড়্গ উদ্যত করিয়াছিল।

ইস্‌লাম জলদ গম্ভীর রবে ঘোষণা করিয়াছিল— "পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, যে কেহ সৎকার্য করে ও ঈমানদার হয়, পরে তাহাকে আমি নিশ্চয় নিশ্চয় পবিত্র জীবনে জীবিত করিব এবং তাহারা যে উত্তম কার্য করিতেছিল, তাহার বিনিময়ে নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দিব।"[১]

"নিশ্চয় (আল্লাহ্‌র উপর) আত্মসমর্পণকারী ও আত্মসমর্পণকারিণীগণ, ধর্মবিশ্বাসী ও ধর্মবিশ্বাসিনীগণ, (খোদাতা'লার) অনুগত ও অনুগতাগণ, সত্যবাদী ও সত্যবাদিনীগণ, ধৈর্যশীল ও ধৈর্যশীলাগণ, বিনয়ী ও বিনয়িনীগণ, দাতা ও দাত্রীগণ, রোযাব্রত পালক ও রোযাব্রতা পালিকাগণ, স্বীয় ইন্দ্রিয় রক্ষাকারী ও রক্ষাকারিণীগণ, আল্লাহ্‌কে প্রচুর স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীগণ তাহাদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রাখিয়াছেন।"[২]

হয্‌রত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কলেমা, নমায, যকাত, হজ্জ ও রোযাকে ইসলামের পাঁচটী স্তম্ভ (আরকান) বলিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটীতে নরবারীর সমান অধিকার তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। হজ্জের সময় যখন লক্ষ লক্ষ পুরুষের মধ্যে নারীরা অনাবৃত মুখে হজ্জব্রত সম্পাদন করে, তখন হয্‌রতেব সাম্যবাদের শিক্ষা জাজ্বল্যমানরূপে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। কা'বা প্রদক্ষিণ সময়ে পর্দানশীন

১ কুর'আন, সূরাহ্ ঃ নহল। ২. কুব্'আন, সূরা ঃ আহয্যাব।

নারীদের পুরুষদেব সহিত সমকক্ষতা অনেক পুরুষের মনে বিস্ময় বা বিদ্বেষ উৎপাদন করে। হযবতের পর একবার ইবনে হিশাম ইহা নিষেধ কবিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে 'আতাঅ তাঁহাকে এই বলিয়া নিবৃত্ত করেন যে, যখন রসূলুল্লাহের স্ত্রীরা পুরুষদের সঙ্গে কা'বা প্রদক্ষিণ করিযাছেন, তখন তিনি কিরূপে ইহা নিষেধ করিতে পারেন ?[৩] ইহার পরে আর কেহই এই বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতে সাহসী হয় নাই।

হযরত নারীদিগকে রজস্বলা অবস্থায় ও প্রসবান্তে কয়েক দিন ভিন্ন সর্ব অবস্থায় পুরুষদের ন্যায় কুর'আন ও নমায পড়িবার বিধান দিয়াছেন। তাঁহার সময়ে সাধারণতঃ উষাকালীন উপাসনায় নারীরা গাত্রাবরণে আবৃতা হইয়া পুরুষদেব সহিত মসজিদে নমাযে যোগদান করিতেন।[৪] কতক স্ত্রীলোক নৈশ-উপাসনাতেও মসজিদে যাইতেন। হযরত বলিয়াছিলেন, "যদি রাত্রি কালে মসজিদে যাইতে তোমাদের স্ত্রীরা অনুমতি চায়, তবে অনুমতি দিবে।"[৫] অন্যান্য সময়েও মসজিদে উপস্থিত হইতে নারীদের প্রতি কোনও নিষেধ ছিল না। হযরত বলিয়াছিলেন, "স্ত্রী (মসজিদে আসিবার) অনুমতি চাহিলে, স্বামী যেন নিষেধ না করে।"[৬] হয্রত 'উমরের স্ত্রী রাত্রির ও ভোরের নমাযে মসজিদে যাইতেন। তাঁহার স্বামী ইহা পছন্দ না করিলেও কখনও নিষেধ করিতে সাহসী হন নাই ; কেননা হয্রত বলিয়াছিলেন, "আল্লাহের দাসীদিগকে আল্লাহের মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না।"[৭] নারীরা পুরুষদের পশ্চাতে থাকিয়া নমাযে যোগ দিতেন। শান্তিবচন (সালাম) উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মসজিদ হইতে সত্বর চলিয়া যাইতেন। হয্রত ও তাঁহার শিষ্যেরা সালাম উচ্চারণের পর কিছুক্ষণ বসিয়া অপেক্ষা করিতেন, পরে অন্য নমায পড়িতেন।[৮] হয্রত বলিয়াছিলেন, "আমি যখন নমাযের জন্য দণ্ডায়মান হই, নমায দীর্ঘ করিতে আমার ইচ্ছা হয়; কিন্তু ছোট ছেলে-মেয়েদের কান্না শুনিয়া আমি নমায সংক্ষেপ করি, কারণ তাহাদের মাতাদিগকে কষ্ট দেওয়া আমার ভাল লাগে না।[৯]

পাঁচ ওয়াক্তের নমাযে ও জুমু'আর নমাযে নারীদের যোগদান ইচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু দুই 'ঈদের নমায সম্বন্ধে হয্রত আদেশ দিয়াছিলেন যে, "সকল নারী এমন কি রজস্বলা ও অন্তঃপুরবাসিনী যুবতীরা পর্যন্ত যেন 'ঈদের ময়দানে যায় এবং মুসলমানদের জমাত ও দো'আয় যোগদান করে, তবে রজস্বলা স্ত্রীলোকেরা নমাযের স্থান হইতে আলাহিদা থাকিবে।" একটি স্ত্রীলোক বলিল, "হে আল্লাহের রসূল, যদি কোন স্ত্রীলোকের চাদর না থাকে?" তিনি উত্তর দিলেন, "তাহার সঙ্গিনী তাহাকে চাদর দিবে।"[১০]

আঁ হয্রত ঈদ ও বকরা 'ঈদের দিন ময়দানে 'ঈদের নমায পড়িতেন। নমাযের পর তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা (খুতবাঃ) করিতেন। পরে নারীদিগের নিকটে আসিয়া উপদেশ দিতেন। তিনি বিশেষ করিয়া সকলকে দান করিতে বলিতেন।

---

৩. বুখারী কিতাবুল হজ্জ্। ৪ বুখাবী হযবত 'আইশাঃ হইতে বর্ণিত হদীস। ৫. বুখারী ইবন 'উমব হইতে বর্ণিত। ৬. বুখাবী ইবন 'উমব হইতে বর্ণিত। ৭. বুখারী ইবন 'উমর হইতে বর্ণিত। ৮ বুখারী হয্বত উম্ম সালমাঃ হইতে বর্ণিত। ৯. বুখারী আবূ কতাদাঃ হইতে বর্ণিত। ১০ বুখারী ও মুসলিম হইতে মিশকাতে উদ্ধৃত উম্ম 'আতিয্যাঃ হইতে বর্ণিত।

স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই অলঙ্কার দান করিত।[১১] 'ঈদের নমাযে হযরতের স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দান সম্বন্ধে বুখারী ও মুসলিমে আবু স'ঈদ খুদরী, বুখারী ও নিসাঈতে জাবির, বুখারীতে ইব্ন আব্বাস এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হয্রতের অনেক শিষ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জুবাইজ 'আতাঅকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এখনও (হয্রতের পরলোক গমনের পরে) ইমামের খুতবার শেষে স্ত্রীলোকদিগের নিকট গিয়া উপদেশ দেওয়া আবশ্যক কি না? তাহাকে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "নিশ্চয়ই ইহা তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। ইহা না করিবার তাঁহার কি অধিকার আছে?"[১২]

কয়েকটী বিশেষ বিধানের সহিত নারীদের জমাতে পুরুষের ইমামতি কোন সময়েই নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু হয্রতের সময়ে কখন কখন নারীরাও নারীদের জমাতের ইমামতি করিতেন। হযরত 'আইশাঃ ও হয্রত উম্মে সলমাঃ (হযরতের পত্নীদ্বয়) তারাবীহের নমাযে এবং ফরয নমাযে স্ত্রীলোকদের ইমামতি করিয়াছিলেন।[১৩] হয্রতের অনুমতিক্রমে উম্মে ওরকাঃ নাম্নী শিষ্যা নিজের পরিজনের ইমামতি করেন।[১৪] হয্রতের পত্নী উম্মে সলমাঃ স্ত্রীলোগদিগকে লইয়া তারাবীহের নমায পড়িতেন এবং তাঁহার দাসী হসন বছ্রীর মাতা তাঁহাদের ইমাম হইতেন।[১৫]

নারীদের এইরূপ ধর্মের স্বাধীনতা অনেক পুরুষের নিকট, এমন কি নারীদেরও নিকট ভাল বোধ হইত না। কিন্তু হয্রতের দৃষ্টান্ত ও উপদেশের প্রভাবে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে নিষেধ করিতে সাহসী হন নাই। একদিন ইবন 'উমর বলিতেছিলেন যে, হযরত বলিয়াছেন, "তোমরা আল্লাহের দাসীদিগকে মসজিদে নমায পড়িতে নিষেধ করিও না।" ইহা শুনিয়া তাঁহার এক পুত্র বলেন, "আমি নিশ্চয় নিষেধ করিব।" তাহাতে ইব্ন 'উমর অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং যাবজ্জীবন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।[১৬] বর্তমান সময়ের নিষেধকারী 'উলেমা ইহা স্মরণ রাখিবেন কি? এই সম্বন্ধে বুখারীর একটি হদীস উদ্ধৃত করিতেছি। হাফসাঃ বিনত সীরীন বলেন – আমি আমার যুবতী কন্যাগণকে 'ঈদের দিন ('ঈদের ময়দানে) যাইতে নিষেধ করিলাম। একদিন একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বনী খলফের মহলে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি বারটি যুদ্ধে হয্রতের সঙ্গী ছিলেন। তন্মধ্যে ছয়টিতে তাঁহার ভগিনী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার ভগিনী বলেন, "আমরা (স্ত্রীলোকেরা) পীড়িতদের সেবা করিতাম ও আহতদের চিকিৎসা করিতাম।" তিনি (ভগিনী) একদিন হয্রতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহের রসূল, যদি কোন স্ত্রীলোকের চাদর না থাকে তবে 'ঈদের দিনে বাহিরে না যাওয়া কি তাহার পক্ষে পাপ?" হযরত উত্তর দিয়াছিলেন, "তাহার সঙ্গিনী যেন তাহাকে নিজের (অতিরিক্ত) চাদর দেয় এবং নারীদের কর্তব্য যেন তাহারা পুণ্যে ও মুসলমানদের মঙ্গল প্রার্থনায় যোগদান করে।" পরে যখন উম্মে 'আতিয়্যাঃ আসিলেন আমি (হফসাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি হয্রত রসূলুল্লাহ হইতে এ বিষয়ে কিছু শুনিয়াছেন কি?" তিনি উত্তর করিলেন, 'আমার পিতা তাঁহার জন্য উৎসর্গ হউন। হাঁ, উম্মে 'আতিয়্যাঃ যখন হয্রত

---

১১ মুসলিম হইতে মিশ্কাতে উদ্ধৃত আবু স'ঈদ খুদরী হইতে বর্ণিত। ১২ বুখারী কিতাবুল 'ঈদায়ন
১৩ ইবন শয়বাঃ প্রভৃতি হইতে মৌলানা 'আব্দুল হাইয়ের উমদাতুর রি'আয়াঃ টীকায় উল্লিখিত।
১৪. আবূ দাউদ হইতে উক্ত টীকায় উল্লিখিত। ১৫. মৌলানা 'আবদুল হক্ক দেহলভীর মা সবত বিসসুন্নাঃ। ১৬ মুসলিম, ইবন মাজাঃ ও আহমদ, সলিম হইতে বর্ণিত।

সম্বন্ধে বলিতেন, তখন এইরূপ বলিতেন। আমি তাঁহাকে (হয্‌রতকে) বলিতে শুনিয়াছি 'যুবতী অন্তঃপুরবাসিনী এবং রজস্বলা স্ত্রীলোক যেন ('ঈদের দিনে) বাহিরে বেরোয় এবং পুণ্যে ও মুসলমানদের মঙ্গল প্রার্থনায় উপস্থিত থাকে। রজস্বলা স্ত্রীলোক নমাযের স্থান হইতে আলাহিদা থাকিবে।' হাফসাঃ বলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রজস্বলা স্ত্রীলোক! তিনি (উম্ম 'আতিয়্যাঃ) বলিলেন, 'কেন রজস্বলা স্ত্রীলোকেরা কি (হজ্জের সময়) আরাফাতে এবং অমুক অমুক কার্য্যে উপস্থিত থাকে না?' "

অবশ্য আঁ হয্‌রত স্ত্রীলোকদের বেশভূষার ও গন্ধ তৈলের জাঁকজমক দেখাইবার জন্য নমাযের জমাতে যাওয়া পছন্দ করেন নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন, "হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে বেশভূষা দেখাইবার জন্য মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও; কেন না ইহুদী জাতি, যে পর্যন্ত না তাহাদের স্ত্রীলোক লোক দেখাইবার জন্য মসজিদে যাওয়া আরম্ভ করিল, অভিশপ্ত হয় নাই।"[১৭] এরূপ বেশভূষাপ্রিয় নারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া হয্‌রত 'আইশাঃ বলিয়াছেন ঃ "তাহার (হয্‌রতের) পরে নারীরা যাহা আরম্ভ করিয়াছে, তাহা যদি আল্লাহের রসূল দেখিতেন, তবে অবশ্য তাহাদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন, যেমন ইহুদী জাতির স্ত্রীলোকদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল।"[১৮] যাঁহারা বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার ফ্যাসানপরায়ণা গির্জাযাত্রিণীদিগকে দেখিয়াছেন তাঁহারা সাবধান উক্তির আবশ্যকতা নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। কিন্তু কতকগুলি বিলাসিনীর জন্য সমস্ত নারীজাতিকে ধর্মের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা ইস্‌লাম কখনই সমর্থন করিতে পারে না। হয্‌রতের বহু পরে আবান ইব্‌ন 'উসমানের এবং (খলীফাঃ) 'উমর ইব্‌ন 'আবদিল 'আযীযের সময়েও নারীরা 'ঈদের পরের দুই রাত্রি মসজিদে পুরুষদের সহিত আল্লাহু আকবর ধ্বনি করিতেন।[১৯] বর্তমান যুগের 'উলেমা যাহাই বলুন না কেন, এখনও মুসলিম রাজ্যসমূহে নারীরা পুরুষদের সহিত ইস্‌লামের বিধান অনুযায়ী 'ঈদের ময়দানে ও মসিজদে নমাযে যোগদান করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মসজিদে এখনও নারীদের জন্য পৃথক্ গ্যালারী দৃষ্ট হয়।

আজ ইসলামের নব জাগরণের দিনে হয্‌রতের এই লুপ্ত সুন্নত পুনরায় প্রচলিত করার প্রয়োজন আছে। হয্‌রত বলিয়াছেন "যে আমার সুন্নতের কোন এক সুন্নতকে, যাহা আমার পরে মৃত হয়, পুনর্জীবিত করিবে, সেও সেই সুন্নতের অভ্যাসকারীদের সমান পুণ্য লাভ করিবে, তাহাদের পুণ্য হইতে কিছুই কম করা হইবে না।"[২০] তিনি আরও বলিয়াছেন— "যে সময় আমার উম্মত আমার সুন্নতকে নষ্ট করিয়া দিবে, সেই সময়ে যে কেহ আমার সুন্নতকে দৃঢ়রূপে ধরিবে, তাঁহার শত শহীদের পুণ্য লাভ হইবে।"[২১]

---

১৭. ইব্‌ন 'আবদিল বর তহমীদ পুস্তকে 'আইশাঃ হইতে বর্ণিত। ১৮. বুখারী। ১৯. বুখারী কিতাবুল্ 'ঈদায়ন। ২০. মিশ্‌কাতে উদ্ধৃত তিরমিযীতে বিলাল ইবনে হারিস মুযনী হইতে বর্ণিত, নিসাঈতে 'উমর ইব্‌নে 'আউফ হইতে বর্ণিত। ২১. বায়হকী হইতে মিশ্‌কাতে উদ্ধৃত আবু হুবায়রাঃ হইতে বর্ণিত।

** এই প্রবন্ধ ঢাকায় যখন নারীদের 'ঈদেব নমাযের জমাত নিয়ে মত বিরোধ হচ্ছে, তখন লিখিত। সর্ব প্রথম এই জমাতে ডক্টর সাহেব ইমামতি করেন। প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ ঃ ॥ সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল বার্ষিকী, ১২শ বর্ষ, ১৩৪৬ ॥ — প্রকাশক।

ইস্‌লামের আদর্শ ও আমাদের আশা

বর্তমান সময়ে যখন একে একে মোসলেম রাজ্যগুলি মুছিয়া যাইতেছে, অশ্রু ভারাক্রান্ত নেত্রে অতীতের দিকে চাহিয়া মহাকবির ভাষায় বলিয়া উঠিতে হয় ঃ —

কুসুম দাম সজ্জিত, দীপাবলি তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী, কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী,
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী।

পশ্চাতে উজ্জ্বল গৌরবময় অতীত, সম্মুখে কুহেলিকাচ্ছন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। এই উভয়ের সন্ধিস্থলে কঠোর বর্ত্তমানের উপর দাঁড়াইয়া অতর্কিত ভাবে মুখ হইতে এই প্রশ্ন বাহির হইয়া পড়ে–

আমাদের কি কিছু আশা ভরসা আছে? জগতের অনেক অসভ্য, অর্দ্ধ সভ্য জাতি পর্যন্ত খরবেগে উন্নতির দিকে ধাইয়া চলিল। কেবল কি মুসলমান, বিশেষ বাংলার মুসলমান, জড়ের ন্যায় অচল অটল থাকিবে? তাহার কি কিছু আশা ভরসা নাই? শুধু সে কি জাতীয়-জীবন যুদ্ধে পরাজিত, লাঞ্ছিত, দলিত মথিত হইয়া তিরোহিত হইবার প্রতীক্ষায় আছে? ভাবিবার কথা বটে!

দেখা যাউক অন্যান্য ভাগ্যবান্ জাতিদিগের তুলনায় মুসলমানের স্থান কোথায় হইতে পারে। দেখা যাউক তাহার ধর্ম্ম ও সমাজ, আকৃতি ও প্রকৃতি তাহার উন্নতির কত দূর সহায়ক বা নিবারক।

ইস্‌লামের জাতীয় আদর্শ

খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে যত উপদেশ দিউন না কেন, য়ূরোপীয় জাতিগণের সহানুভূতি জাতির (Nation) ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। টিউটনে টিউটনে, স্লাভে স্লাভে, আংগ্লো সাক্‌শনে আংগ্লো সাক্‌শনে জাতীয় বন্ধন। তাহার মধ্যে আর কোন জাতির প্রবেশ অধিকার নাই, সে যতই খ্রীষ্টান হউক না কেন। ভৌগোলিক সীমা বা ভাষার মধ্যে য়ূরোপীয়ের জাতি (নেশন)। কিন্তু আল্‌হামদু লিল্লাহ্ মুসলমানের জাতি কোন দেশের বা ভাষার বেষ্টনীর দ্বারা বেষ্টিত নহে, বিশ্বের

মুসলমান একজাতি (কওম)। বাহিরের লোকের নিকট মুসলমান ইরাণী, মিসরী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্তানী, কিন্তু মুসলমান মুসলমানের নিকট এক মাত্র মুসলমান ব্যতীত তাহার কোন জাতীয় সংজ্ঞা নাই। হিন্দুগণ এখন হিন্দুজাতি হইতে চলিয়াছেন। কিন্তু এই জাতীয় ভাব হিন্দুর নূতন আমদানী। আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম গত এক নাম মুসলমান দিয়াছে সকলকে হিন্দু বলিয়া; আর বাঙ্গালী, বিহারী, মারাঠী, পাঞ্জাবী সকলকে এক জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করিবার কল্পনা আনিয়াছে ইংরাজ! হিন্দুর আসল জাতীয় ভাব তাহার জাতে। হিন্দুকে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি জাতি, সে বলিবে ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য, কি ঐরূপ একটা। হিন্দুর জাতি হিন্দুর Caste-এ। অহিন্দুর ছোঁয়া লাগিলে সে জাতি যায়। অধিক কি চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর পাক স্পর্শে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর জাতি যায়। মুসলমানের জাতি তাহার ধর্মে। মুসলমানকে জিজ্ঞাসা কর তোমার জাতি কি — সে বলিবে মুসলমান, অন্য কোন উত্তর তাহার নিকট পাইবে না। আইন আদালতে মুসলমান লেখে জাতি মুসলমান। হিন্দু লেখে, ব্রাহ্মণ, কি কৈবর্ত্ত, কি পোদ, কি এরূপ একটা Caste.

য়ূরোপীয়ের জাতি হইতেছে তাহার Nation-এ। য়ূরোপীয়কে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে ইংরাজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি। জাতির আদর্শ দ্বারা জাতির ভাগ্যচক্র নিয়ামিত হয়। য়ূরোপীয়গণের জাতীয় আদর্শের ফলে যিশুখ্রীষ্টের ভক্তগণের মধ্যে যত শোণিতপাত হইয়াছে, অতীতের সাক্ষী ইতিহাস তাহা জলদ গম্ভীর রবে বলিয়া দেয়। মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নাই, একথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু মুসলমানের অনৈক্য তাহার জাতীয় আদর্শের খর্ব্বতায় এবং খ্রীষ্টানের অনৈক্য তাহার জাতীয় আদর্শের পূর্ণতায়। য়ূরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান অশান্তির একটা প্রধান কারণ যে তাহাদের সংকীর্ণ জাতীয় আন্দোলন, তাহা মনীষিগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

হিন্দুর জাতীয় আদর্শের ফলে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এমন কি এক দেশবাসী এক ভাষাভাষিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হইয়া রাষ্ট্রীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, হিন্দুর ক্ষুদ্র জাতীয় আদর্শ ছুঁৎমার্গে পরিণত হইয়াছে। মাদ্রাজে আবার এই আদর্শ স্পর্শদোষের অপেক্ষা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দোষ আবিষ্কার করিয়াছে। বট গাছের শিকড় দ্বারা শতধা বিদীর্ণ মন্দিরের ন্যায় হিন্দু সমাজ খণ্ডশঃ কৃত। A house divided itself cannot stand—যে গৃহ বহুধা বিভক্ত তাহা দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। পবিত্র ধর্ম্ম মন্দির পর্য্যন্ত এই ধ্বংসকর আদর্শের প্রভাব হইতে নিস্তার পায় নাই।* স্বীকার করি, আরব আজমের কলহ ছিল, শুউবিয়া আন্দোলন ছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। তাহা ধর্ম্মের নামে হয় নাই। তাহা জাতীয় আদর্শে হয় নাই। তাহা প্রাক্-ইস্‌লামের প্রাচীন প্রথার আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা। ইস্‌লামের সাম্য মন্ত্রে তাহা ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার আশরাফ আতরাফের কলহ বাঙ্গালী হিন্দুর সংশ্রব দোষে। তাহা কিন্তু চণ্ডাল ব্রাহ্মণের জাতিগত ভেদের সহিত নগণ্য। হিন্দুর জাতীয় আদর্শের ফলে মুচি, মেথর, মুর্দ্দাফরাশ, হাড়ি, ডোম, কাওরা প্রভৃতি এমন কতকগুলি জাতি সৃষ্ট হইয়াছে যে তাহাদের উদ্ধার রামকৃষ্ণ মিশন, Depressed

* মহাত্মা গান্ধীর জীবননাশ ইহার একটি শোকাবহ উদাহরণ। —প্রকাশক।

Class Mission প্রভৃতি আধুনিক বিশ্বমানবতার ভাবে অনুপ্রাণিত সমাজের চেষ্টাতেও অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠিতেছে না। যদি একদিন হিন্দুর জাতীয় আদর্শ নূতন করিয়া গঠিত হয়, তবে এই পতিত জাতিদিগের উদ্ধারের আশা করা যাইতে পারে। নচেৎ সর্ব্ববিধ উন্নতির দ্বার তাহাদের জন্য রুদ্ধ। হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ ব্যতীত তাহাদের মুক্তির আর পথ নাই। ইহারাই একদিন ভারতের ইস্‌লামের দল পুষ্টি করিয়াছিল। আজ ইহারা খ্রীষ্টানের দল বৃদ্ধি করিতেছে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ — এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনও উপাস্য নাই — এই তৌহিদ বাণীর সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লাম গুরু মুসলমানকে যে মহাজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, নানা উত্থান পতনের ভিতর দিয়া নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহিয়া মুসলমানের সেই জাতীয় আদর্শ আজ পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। যে মন্ত্রের প্রভাবে ইস্‌লাম-কেশরী হয্‌রত 'উমর কুরায়শী আভিজাত্য অভিমান ভুলিয়া হাবশী দাস হয্‌রত বিলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ "য়া সয়্যাদী য়া সয়্যাদী"— হে প্রভো! হে প্রভো! বলিয়া ফিরিতেন, সেই মহামন্ত্র দীর্ঘ চতুর্দ্দশ শত বৎসরেও তাহার প্রভাব একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই। জাতীয় আদর্শের সাধকরূপে ইস্‌লাম কয়েকটি বাহ্যিক ব্যাপারকে ইস্‌লামের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। ধর্ম্মের নিম্নেই জাতীয়তার প্রধান সাধক ভাষা। এইজন্য ইস্‌লাম দেশীয় ভাষার অতিরিক্তরূপে, তাহার জাতীয় ভাষা করিয়াছে তাহার আল্লাহ্ ও রসূলের বাণী আরবীকে। ইস্‌লাম জানে খোদার নিকট যে ভাষা আদৃত হয়, তাহা হৃদয়ের ভাষা। কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মকর্ম্মে আরবী ব্যতীত আর কোন ভাষার দখল দিবে না। ইহা ইস্‌লামের গোঁড়ামি নয়। ইহা তাহার জাতীয় আদর্শের সাধনা। মুসলমানের নাম পর্যন্ত এই জাতীয় ভাষায়। অন্য জাতির নাম শ্রবণে তাহাকে কোন দেশের অধিবাসী, তাহা জানিতে পারিবে। কিন্তু মুসলমানের নাম শুনিয়া সেটি পারিবার যো নাই। মুসলমান যে দেশের বাসী হউক বা যে ভাষার ভাষী হউক, তাহার নাম আরবী।

ইংরাজ প্রোটেষ্টান্ট জার্ম্মান প্রোটেষ্টান্ট গির্জার উপাসনায় যোগ দিতে পারে না। ফরাসী প্রোটেষ্টান্ট ইংরাজ প্রোটেষ্টান্ট গির্জায় যায় না। কারণ য়ূরোপের জাতি ভেদের ন্যায় গির্জারও জাতি ভেদ আছে। একজন চীনা বৌদ্ধ সিংহলের বৌদ্ধ মন্দিরের ভাষা বুঝিবে না। একজন ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ জাপানী মন্দিরে আসিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবে। এমন কি সৃষ্টিকর্ত্তার নাম পর্য্যন্ত এক ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন। God, Gott, Diu, Deus, Theos প্রভৃতি। কিন্তু মুসলমান যে দেশেরই হউন, মসজিদ কখনও তাহার বিদেশী হয় না। মসজিদের মিনারা হইতে মুয়ায্যিন যখন আল্লাহু আক্‌বার আল্লাহু আক্‌বার ধ্বনিতে নমাযের জন্য উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করে, তখন বিদেশী মুসলমানের বিরহতপ্ত হৃদয়ে জন্মভূমির সুখস্মৃতি স্বতঃই ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে সাগর, পর্ব্বত, মরুকান্তারের পরপারে আপনা জন্মভূমিতে যেন ফিরাইয়া লইয়া আসে। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখে একই কলেমা শুনিবে। একই প্রীতি সম্ভাষণ শুনিবে, জাতীয়ত্বের এমন বাঁধা watch word আর কোথাও পাইবে না।

কুর'আন শরীফ বলেন— "ধর্ম্ম-রূপ পরিচ্ছদ' ইহাই উত্তম।" এতৎ সত্ত্বেও ইসলাম-গুরু বলিয়াছেন— "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করিবে, সে ব্যক্তি তাহার অন্তর্গত।" ইসলাম সমগ্র মুসলমান জাতির এক পরিচ্ছদ চায়। কেবল পরিচ্ছদ নয় বাহ্যিক আকৃতিতেও ইসলাম সাম্য দাবী করে। এইজন্য দাড়ী বাখিবার এবং গুম্ফ খর্ব করিবার জন্য ইসলাম গুরুর আদেশ। ইস্‌লাম বাহ্যিক আকৃতির উপাসক নহে। প্রেবিত মহাপুরুষ (দঃ) বলিতেছেন— "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের চেহাবা দেখেন না, কিংবা তোমাদের ধন দেখেন না, কিন্তু তিনি দেখেন তোমাদেব হৃদয় এবং তোমাদের সংকল্প।" তবুও ইস্‌লাম যে বাহ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা শুধু জাতীয়তার সাধক বলিয়া। মুসলামন যে দেশ হইতে আসুক বা যে আবহাওয়া হইতে আসুক, বাহ্য আকৃতিতে তুমি তাহাদের মুসলমান বলিয়া ধবিয়া ফেলিবে। এক সৈন্য দলের ন্যায় পৃথিবীস্থ মুসলমানের এক Uniform. ইহাব ভিত্তি ধর্মান্ধতার উপর নহে, জাতীয় আদর্শের উপর।

মুসলমানের জাতীয় মিলনক্ষেত্র মক্কাধাম। মুসলমানের ধর্ম কোন মন্দিরের চতুষ্প্রাচীরের মধ্যে বাস করে না। ভক্তের হৃদয় ব্যতীত তাহার আর কোন মন্দির নাই। তথাপি কুরআন শরীফ সমর্থ পক্ষে হজ্জকে নমায রোযার ন্যায় অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই যে বিধান ইহা কেবল পুণ্যসাধক বলিয়া নহে, জাতীয়তার সাধক বলিয়াও। প্রতি বৎসর মুস্‌লিম জগতের প্রত্যেক জনপদ হইতে ভক্ত আসিয়া, হজ্জব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যখন মক্কার আবাফাত প্রান্তরে সমবেত হইয়া, ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠে "লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক"— উপস্থিত. হে আল্লাহ্ উপস্থিত, ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে আববী. তুরকী, তাতারী, ইরাণী, আফগানী, চীনা, সুদানী, বার্ব্বারী, মালয়ী, যাভানী. হিন্দাস্তানী বলিয়া মনে হইবে না, মনে হইবে তাহাদের যেমন এক আল্লাহ্, এক রসূল, এক কিতাব, এক ধর্ম, এক পরিচ্ছদ, সেইরূপ তাহারা একই জাতি। কবি কেমন সুন্দর গাহিয়াছেন!

চিনো আরব হমারা হিন্দুস্তাঁ হমারা।
মুস্‌লিম হৈঁ হাম ওতন হৈঁ সারা জহাঁ হমারা॥ [ইক্‌বাল]।

যাহাদের জাতীয় ভাব এত বিরাট, এত মহৎ, এত নিবিড়, সে জাতির কি কোন আশা নাই?

ইস্‌লামের সামাজিক আদর্শ

মানব জাতির অৰ্দ্ধেক নারী জাতি। পৃথিবীর ইতিহাসে এই নারী জাতিকে ইস্‌লামই সর্ব প্রথমে তাহার স্বত্ব প্রদান করিয়াছে। Married Women's Separate Property Act পাস হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে কোন বিবাহিতা নারীর পৃথক্ সম্পত্তি থাকিতে পারিত না। হিন্দু স্বামী হইতে স্ত্রীর পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারে না। ইহা তাহার উচ্চতম আদর্শ। কিন্তু আধুনিক হিন্দু ধর্মে নারীর প্রকৃত স্থান

কি? বেদে কিংবা পূজা অর্চ্চনায় তাহার অধিকার নাই। ক্রীতদাসের ন্যায় সে যে কোন সম্পত্তি উপার্জ্জন কবিবে, তাহা তাহার স্বামীর প্রাপ্য। সম্পত্তির উপর তাহার স্বায়ী স্বত্ব নাই। স্বামীর মরণান্তে তাহাব বাঁচিবার অধিকার আছে কি না সন্দেহ।

যখন মহাত্মা রামমোহন রায় আইন দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন স্যাব রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু নেতৃগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া রামমোহনের সাধু উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করিবার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি"— স্ত্রী স্বাধীনতা পাইতে পারে না, ইহা আধুনিক হিন্দু সমাজের ও হিন্দু ধর্মের মান্য নীতি। চির দাসত্ব তাহার বিধাতৃদত্ত ভাগ্য। কবি হেমচন্দ্র "ভারতমহিলা" কবিতায় ভারতের নারীর করুণ চিত্র দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার জন্য ক্রন্দন করিয়াছেন। ইস্‌লামে বাল্যবিবাহ আছে। কিন্তু তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। শিক্ষা বিস্তারের সহিত এই কদর্য প্রথা বিলুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দু তাহার ধর্মশাস্ত্র মানিয়া বাল্যবিবাহ উঠাইতে পারিবে কি?

বিধবাবিবাহ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত কিনা জোর করিয়া বলিতে পারিব না। কিন্তু হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা ফলবতী হইবে না — ইহা একরূপ নিশ্চিত। হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান সমাজে সেইরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। ১৮৭০ সালে বাঙ্গালার মুসলমান বঙ্গবাসী হিন্দু অপেক্ষা জনসংখ্যায় অল্প ছিল। এক্ষণে বঙ্গবাসী মুসলমান বঙ্গবাসী হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় প্রায় সিকি কোটি বেশী। মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত বিধবাবিবাহ। বিবাহ যদি কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায বহুবিবাহও কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। কবি ও দার্শনিকগণ বিবাহের যে অর্থই প্রদান করুন না, সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চক্ষে কিন্তু বিবাহ বংশ বৃদ্ধির জন্য। বহুবিবাহ দ্বারা বিবাহের এই উদ্দেশ্য যে পরিমাণে সফল হইতে পারে, এক বিবাহ দ্বারা তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। বর্ত্তমানে য়ূরোপীয় সমরের ফলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্ত্রীজাতির সংখ্যাধিক্য ও তদ্ধেতু নানাবিধ পাপের প্রাচুর্য্য দেখিযা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বহুবিবাহের প্রতি এখন আর নাসিকা কুঞ্চন করিতে পারেন না। যাঁহারা দেশাচারের দাস নন, এমন উন্নতমনাঃ দূরদর্শী রাজনীতিকগণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহুবিবাহ প্রচলন বিষয়ে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছেন। বহুবিবাহ যে অনেক সময়ে সাংসারিক সুখশান্তি বিনাশকারী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইস্‌লাম চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ সিদ্ধ রাখিলেও এক বিবাহকেই প্রশস্ত বলিয়া খ্যাপন করিয়া দূরদর্শিতাব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। "যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে ন্যায়াচরণ করিতে পারিবে না, তবে এক বিবাহ কর," কুর্‌আনের এই উক্তি যেমন এক বিবাহের সাহায্য করিয়াছে, তেমনি আবশ্যক হইলে চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ সিদ্ধ রাখিয়া ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, স্ত্রী সংখ্যাধিক্য স্থানেও স্বামী লাভ সহজসাধ্য করিয়াছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিয়াছে। ইসলামরাষ্ট্রে অবিবাহিতা মাতা, বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া নারী কিংবা নিঃসন্তান পিতা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। বহুবিবাহ থাকিলে নেপোলিয়ামকে জোসেফাইন পরিত্যাগ রূপ পাপে পতিত হইতে

হইত না। কত অজ্ঞাতনামা নিঃসন্তান স্বামীকে যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম পাশে আবদ্ধ থাকিয়া নেপোলিয়ানের ন্যায় পত্নী ত্যাগরূপ পাপ বা সন্তানহীনতার বিষম মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা কে বলিবে ?

দুইটি আত্মা পরস্পর মিলিত হইয়া জগতের, তথা নিজেদের কল্যাণ সাধন করিবে এবং তদ্দারা কল্যাণময়ের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া চির মিলন ভোগ করিবে। ইহাই ইস্‌লামের বিবাহের আদর্শ। এই কল্যাণ সাধন বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের ভেদ নাই। পুরুষের যেমন কল্যাণ সাধন প্রয়োজন, তদ্রূপ নারীরও! এই কল্যাণ সাধন বিষয়ে নারী পুরুষের সাহায্যকারিণী এবং পুরুষ নারীর সাহায্যকারী। কুর্‌আন শরীফ বলিতেছেন, "নারীগণ তোমাদের পুরুষগণের জন্য বসন স্বরূপ এবং তোমরা পুরুষগণ নারীগণের জন্য বসন স্বরূপ।" (সূরাহ্ বকরাঃ)।

নারী পুরুষের ভোগের জিনিস নহে, তাহাব আদরের পুতুল নহে, পুরুষকায়ার ছায়া নহে। জীবন যুদ্ধে নারী পুরুষের সহযোগিনী, জীবনের লক্ষ্যপথে নারী পুরুষের সহযাত্রিণী। নারী যদি পুরুষের দাসী হয়, তবে পুরুষও নারীর দাস, ইস্‌লামে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক — এইরূপ স্বীকার করে। পুরুষের আত্মগ্রাসিনী নীতির ফলে নারীর স্বত্ব খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সেদিন আসিবেই যেদিন মুসলিম মহিলা কুর্‌আনের দোহাই দিয়া, হদীসের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহার ন্যায্য স্বত্ব অধিকার করিবে। যে ইস্‌লাম হয্‌রত আইশাঃ, হয্‌রত ফাতিমাঃ, খাওলা, আস্‌মা, রাবিয়াঃ, সুলতানা রাযিয়াঃ, চাঁদ সুলতানা, গুলবদন বেগম, যেবুন্নিসা প্রভৃতি বীর, ধীর, কবি, রাজনীতিক, ঐতিহাসিক নারীগণকে জন্ম দিতে পারে, তাহার ভবিষ্যৎ আশাহীন হইতে পারে না।

অন্যদিকে খ্রীষ্টান ধর্মে নারীর স্থান কোথায়? সে সেই ঈভের বংশীয়া যে ঈভ আদমের পতনের কারণ হইয়া সমুদয় মানব জাতির আদি পাপের কারণ হইয়াছে। নারী তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে আজও গর্ভধারণরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে। মাতৃত্বের কি সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা! মধ্যযুগে যাহাকে Age of chivalry বীর যুগ বলা হয়, তাহার নারীর পূজার অন্তস্তলে আমরা কি দেখিতে পাই ?

"We find the mediaeval ideal of women curiously deficient and self-contradictory. With all the ceremonial deference and with all the healthy consolations of a nominal precedense, there existed a tacit acceptance of woman's mental inferiority which degraded her to the level of a child, while it professed to exalt her as an angel. Women were treated with gallantry but not with respect. It is well known that on more than one occasion in the middle ages divines gravely discussed the questions whether woman had a soul." (*The Underlying Principle of Modern Legislation by M. J. Brown. 3rd. Ed. P. 62*). অথচ একজন প্রথিতনামা ইংরাজ কবি ইস্‌লাম রাজ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "Oh! to be a woman in a land where a woman has no soul." এবং ইংরেজের বাস্তভোজনকারী একজন বাঙ্গালী লেখক তাঁহার কোন ইতিহাসে মুসলমান ধর্মে নারীর আত্মা নাই, এই মত প্রকাশ করিয়া তাঁহারা অজ্ঞতা ও পরধর্মদ্বেষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

حالق ست ان کویا محلوق نیسں

پونو حق ست ، اں معشوق نیست

নারী বিধাতার ছায়া, সে নহে কামিনী।
নহে সে যে সৃষ্টি, তারে স্রষ্টা অনুমানি॥ [মৌলানা রূমী]

এইরূপ কথা জগতে একজন মুসলমানই বলিতে পারে। তালাক অতি জঘন্য কার্য্য সন্দেহ নাই। ইস্‌লাম গুরুও বলিয়াছেন — "সর্ব্ববিধ বৈধ কার্য্যের মধ্যে আল্লাহের নিকট যাহা অতিঘৃণিত, তাহা তালাক।" কিন্তু এই তালাকও ইস্‌লামের স্বামী ও স্ত্রীগত আদর্শকে বজায় রাখিবার জন্য। দুইটি আত্মা পরস্পর মিলিত হইয়া জগতের তথা নিজের কল্যাণ সাধন করিবে, ইহাই যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে যেখানে শরীরের মিলন ভিন্ন আত্মার মিলন হয় না, কিংবা যেখানে কেন্দ্রবিমুখ (Centrifugal) গতি প্রভাবে দুইটি পদার্থের ন্যায় বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটি আত্মা সর্ব্বদা পরস্পর হইতে সরিয়া যাইতে চায়, কিংবা যেখানে এক রথে যোজিত বিপরীত গমনপ্রয়াসী অশ্বদ্বয়ের ন্যায় দম্পতি কিছুতেই একত্রে কল্যাণপথগামী হইতে পারে না, কিংবা যেরূপ স্থলে হস্ত পদাদি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কর্ত্তন তাহাদের রক্ষা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর মনে হয়, সেখানে তালাক দ্বারা দুইটি বৈরী প্রাণীকে মুক্তি না দিলে, বিবাহের উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হয় না। ব্যভিচার যদি খ্রীষ্টান ধর্ম্মে স্ত্রীত্যাগের কারণ হয়, তবে তদ্রূপ অশান্তিকর অন্য কারণও থাকিতে পারে, যাহাতে বিবাহবন্ধন ছেদন প্রার্থনীয় মনে হইবে। হিন্দু ধর্ম্মে স্ত্রীত্যাগ আছে। কিন্তু পরিত্যক্ত স্ত্রীর কোন গতির ব্যবস্থা নাই। হয় সে চির ব্যভিচারে জীবনাতিবাহিত করুক, নয় চির দারিদ্র্যনিষ্পেষিত হইয়া তাহার পাপ জীবনের অবসান করুক, সমাজ বা ধর্ম্ম তাহার দিকে তাকাইবে না। ইহার ফলে মানব সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ বারনারী সমাজের সৃজন। কুর্‌আনের তালাকের বিধান প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুনঃপুনঃ মিলন সংস্থাপন চেষ্টা করিয়াও মিলন কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না, সেখানেই তালাক সিদ্ধ, অন্যথায় তাহা অতিগর্হিত পাপ কার্য্য। যেদিন কুর্‌আনের আদর্শ ইস্‌লাম সমাজ পুনঃ গ্রহণ করিবে, সেদিন তালাক চিকিৎসাশাস্ত্রে হস্ত পদ ছেদনের ন্যায় সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কদাচিৎ ব্যবহারের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

বহু যুগ হইতে মানব আত্মা স্বেচ্ছাচারিতার কঠোর হস্তদ্বারা নিষ্পেষিত থাকিয়া ফ্রান্স দেশে একদিন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধ্বনি তুলিয়া য়ূরোপ মহাদেশকে প্রকম্পিত করিয়াছিল। সে মহাধ্বনির প্রতিধ্বনি এখনও পৃথিবীময় বাজিতেছে। খ্রীষ্টানের ধর্ম ইহার কোন সমাধান করিতে পারে না। হিন্দুর ধর্ম সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রবল বৈরীরূপে তাহার শাস্ত্রীয় খড়্গ উদ্যত করিয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম সাম্যবাদী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সাম্যবাদ জাতি ভেদ দূর করা ব্যতীত আর কিছু করিয়া দেখায় নাই। কিন্তু ইস্‌লাম কেবল সাম্যবাদ প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। ইস্‌লামের প্রত্যেক বিধানে এই সাম্যবাদ পরিস্ফুট রহিয়াছে। Rational Socialismই ইসলামের ধর্ম্ম। য়ূরোপ আমেরিকার আধুনিক Socialism হইতে

ইস্‌লামের এই পার্থক্য যে, ইসলামের Socialism মুসলমানের গণ্ডির মধ্যে, আর য়ূরোপ আমেবিকার Socialism মনুষ্য সমাজময় ব্যাপ্ত। ধর্মের সহিত তাহাব কোনও সম্পর্ক নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য দেশেব এই বৃহৎ Socialism ইস্‌লামের ক্ষুদ্র Socialism অপেক্ষা সুন্দর বলিযা বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে ইস্‌লামের Socialism ধর্মের উপর স্থাপিত হওয়ায় তাহা যেরূপ দৃঢ় ভিত্তি পাইয়াছে, পাশ্চাত্য Socialism তাহা পায নাই। ইস্‌লামের Socialism সংঘটিত ব্যাপাব (Accomplished fact), পাশ্চাত্য Socialism এখনও সংঘটনশীল। তাহা যখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন কোন আকার ধাবণ করিবে, তাহা এখনও বলা যায় না। অধিকন্তু পাশ্চাত্য Socialism কার্য্যতঃ তাহার মতানুবর্ত্তিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ব্যক্তি Socialism-এর Creed গ্রহণ করে নাই, Socialism তাহার জন্য কিছুই করিবে না। এরূপ স্থলে পাশ্চাত্য Socialism-কে ইস্‌লামের Socialism অপেক্ষা বহুব্যাপক কিছুতেই বলা যায় না। যেমন পাশ্চাত্য Socialism-এর মধ্যে সকলেরই প্রবেশ করিবার অধিকার আছে, তদ্রূপ ইস্‌লামেব Socialism-এর মধ্যে সকলেরই সমান প্রবেশ অধিকার— তাহার দ্বার সদা মুক্ত। انما المومنون اخوات— ইন্নামাল্ মু'মিনুনা ইখওয়াতুন্—নিশ্চয় বিশ্বাসিগণ পরস্পর ভ্রাতা— ইহাই ইস্‌লামের সাম্যবাদের মূল মন্ত্র। তুমি ধনী, সমস্ত ব্যয়বাদে যদি বৎসরে তোমার ৫২॥০ টাকার অতিরিক্ত সঞ্চিত থাকে, তোমার নেট আয়েব ১/৪০ অংশ তোমার দরিদ্র ভাইকে দিতে হইবে। ইহাই যাকাত। ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে যাকাত একটা স্তম্ভ। কুর্‌আনে যেখানে নমাযের কথা আসিয়াছে, প্রায তাহার সঙ্গেই যাকাতের কথা আসিয়াছে। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য যেমন নমায, সামাজিক জীবনের জন্য তেমনই যাকাত। তুমি ধনী; তোমাব অন্য মুসলমান ভ্রাতা দরিদ্র। ব্যবসায়ের জন্য কিংবা কোন সঙ্কটের জন্য সে তোমার নিকট ঋণ প্রার্থনা করিল, তুমি তাহাকে ঋণ দিতে বাধ্য। সে ত ঋণ চাহে নাই, তোমার আল্লাহ্ তোমার নিকট তাহার দ্বারা ঋণ চাহিতেছেন। তুমি তোমার আল্লাহকে ঋণ দিবে না? কুর্‌আন উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছেন— মান্ যাল্লাযী য়ূকরিদুল্লাহা কার্‌দান্ হাছানা— কে আছে, আল্লাহ্‌কে উত্তম কর্জ্জ দিবে? কর্জ্জ দিয়া তুমি তোমার ভ্রাতার নিকট হইতে লাভ আশা করিতে পার না। ঐ লাভ রেবা বা সুদ। তাহা হারাম। যাকাত ও কর্জ্জ হাসানায় Individualism এবং Socialism-এর বিরোধ কেমন সুন্দররূপে ভঞ্জন করিয়াছে। ইহাকেই আমি Rational Socialism বলি।

ইস্‌লামের দায়ভাগও এই Rational Socialism-এর আর একটি উদাহরণ। সম্পত্তি এক হস্তে আবদ্ধ থাকিয়া লোকদিগকে অলস কর্মবিমুখ করিবে, কিংবা সম্পত্তির উপর কাহাবও ব্যক্তিগত অধিকার না থাকিয়া উপার্জন বিমুখ করিবে, ইস্‌লাম এই দুই অতিকে ত্যাগ করিয়া তাহার দায়ভাগের বিধান করিয়াছে। Law of Primogeniture ইস্‌লামের আদর্শের বহির্ভূত। যাঁহারা ইস্‌লামের দায়ভাগ বশতঃ মুসলমান সমাজ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে মনে করেন, তাঁহারা ইস্‌লামের আদর্শ বিষয়ে অজ্ঞ।

Socialism-এর ফলে য়ূরোপ আমেরিকায় যে Democracy-র আবির্ভাব হইয়াছে, সেই Democracy-র মূলনীতি ইসলামেরই। খাদিমুল কওমি রঈসুহুম— জাতিব ভৃত্য জাতির নেতা, ইহা ইস্‌লামের গৃহীত মত। প্রজাগণের মনোনীত ব্যক্তিই রাজা হইবেন, ইহা কুরআন ঘোষণা করিয়াছে এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের (খলীফাঃ চতুষ্টয়ের) দ্বারা সেই আদর্শ বাস্তব জীবনে উদাহৃত হইয়াছে। রাজা রাজ্যের অধিপতি নহেন, কেবলমাত্র রাজ্যের জননায়ক, রাজ্যে রাজার অধিকার নাই, তিনি সাধারণের বেতনভুক্ত কর্ম্মচারী, আধুনিক Democracy-এর এই মতগুলি অবিকল ইস্‌লামের মত। অমুসলমান জাতির সংস্রবে আসিয়া ইস্‌লামের এই মহান্ আদর্শ মুসলমানগণ হারাইযা ফেলিয়াছেন। সেদিন আসিবেই যে দিন ইস্‌লামের এই মহান্ আদর্শ কেবল মুসলমান নহে, পৃথিবীর সকল জাতিই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। বর্ত্তমানে তাহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে।

দাসত্ব প্রথা ইস্‌লামের অন্তর্গত নহে, তাহা ইস্‌লামের বহির্ভূত প্রাচীন জগতের প্রথা, যাহা ইস্‌লাম সমাজে এখনও অল্পাধিক প্রচলিত রহিয়াছে। ক্ষমতাপ্রিয়তা ও বিলাসিতা এই অমুসলমানী প্রথার সাহায্যকারী হইয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইস্‌লামের সাম্যবাদের আদর্শের সম্মুখে, আশা করি, দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হইবে। যদি য়ূরোপ আমেরিকায় Let Ham be thy slave এই Bible উক্তির দ্বারা অনুমোদিত দাসত্ব প্রথা দূরীভূত হইতে পারে, তবে "মানুষ ও জিন কেবলমাত্র আমারই দাসত্ব করিবে এই উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহাদিগকে সৃষ্টি করি নাই" এই আল্লাহের বাণী কেন না মানুষকে মানুষের দাসত্ব হইতে স্বাধীন করিয়া আল্লাহের দাসত্বে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণেব সুবিধা দিবে? যে ইস্‌লাম আরব জাতির দাসত্ব দূরীভূত করিয়াছে, দাসত্বের কঠোরতা মোচন করিয়া তাহাকে পরিবারভুক্ত স্ত্রী-পুত্র স্থানীয় করিয়াছে, সেই ইসলাম ভবিষ্যতে শুধু দাসত্ব প্রথা কেন, সর্ব্ববিধ দাসত্বকে যে দূর করিবে, তাহা স্যার সৈয়দ আহমদ মরহূম, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ নব্য মুসলমানের গ্রন্থে সূচনা করিয়াছে।

ইস্‌লামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ

ইস্‌লামের Foreign Policy বা পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি আলোচনা করিলে ইস্‌লামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশার সঞ্চার হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে বা বৌদ্ধ ধর্ম্মে যুদ্ধ নীতির সম্পূর্ণ অভাব। যদি তোমার বাম গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তবে তোমার দক্ষিণগণ্ড তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও, কোন খ্রীষ্টান সাধু এই নীতির অনুসরণ করিলেও কোন খ্রীষ্টান জাতি এই নীতির অনুসরণ করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। য়ূরোপের এই মহাযুদ্ধের পরে কোন খ্রীষ্টান খ্রীষ্টীয় ধর্মের পূর্ণতা সম্বন্ধে আর গলাবাজি করিতে সাহস করিবেন কি? যুদ্ধ দেশকালপাত্র বিবেচনায় অতি মহৎ কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। ইস্‌লাম যেরূপ সুন্দর এবং সূক্ষ্মভাবে যুদ্ধ নীতির ব্যবস্থা করিয়াছে, আধুনিক International Law তদপেক্ষা বেশী কিছু করিতে পারে নাই।

যিহাদ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে এরূপ ভ্রান্ত প্রচার হইয়াছে, যে, তৎসম্বন্ধে এস্থলে কিছু আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পর ধর্ম্মাবলম্বীকে বলপূর্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যিহাদ নহে, যেস্থলে ধর্ম বা জাতির স্বাধীনতা অন্য জাতি কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, তখনই ধর্ম ও জাতির আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ তাহাই যিহাদ। আক্রমণকারী যুদ্ধে নিরস্ত হইলে কিংবা সন্ধি প্রার্থনা করিলে, তাহার সহিত যুদ্ধ অবৈধ। বালক, স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ অবধ্য। কর প্রদান করিলে বিজিত অমুসলমান সর্বস্বত্ব বিষয়ে মুসলমানের তুল্য। কুর্‌আন শরীফে যিহাদের এই নীতি নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ইস্‌লামে আচার ব্যবহার

এক্ষণে মুসলমানের আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদের কোন আশা আছে কি না দেখা যাউক। এক্ষণে সুপ্রজনন বিদ্যার প্রতি য়ূরোপ আমেরিকার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিরূপে জাতির আকৃতি প্রকৃতি ক্রমশঃ উন্নত হইতে পারে কিরূপে কোন জাতি জীবন যুদ্ধের জন্য উপযোগী হইতে পারে তাহাই সুপ্রজনন বিদ্যার আলোচ্য।

সুপ্রজনন বিদ্যার সিদ্ধান্ত এই যে সামাজিক উন্নতির জন্য অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ উভয়ের আবশ্যক। বঙ্গদেশে সুপ্রজনন বিদ্যার আলোচনার প্রবর্তক শ্রদ্ধেয় শশধর রায় মহাশয় তাঁহার 'মানবসমাজ' নামক পুস্তকের ৪৩ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন "অন্তর্বিবাহ এবং বহির্বিবাহ এই বিবিধ বিবাহ পদ্ধতিই সকল সময় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সমাজের উন্নতির বিশেষ আশা করা যায় না, অন্তর্বিবাহ অর্থে এক জাতীয় জীবগণের মধ্যেই যৌন সম্বন্ধ স্থাপন, ইহাতে জাতি চরিত্রকে স্থায়িত্ব প্রদান করে। আর বহির্বিবাহ অর্থে বিভিন্ন জাতীয় জনগণের যৌন সম্বন্ধ স্থাপন; ইহাতে সমাজ মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করে।" শশধর বাবু তাঁহার উক্তির পরিপোষকতায় টমসনের Heridity নামক পুস্তকের ৫৩৭ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন— "The establishment of successful race or stock requires the alternation of periods of inbreeding in which characters are fixed and periods of outbreeding in which by the introduction of fresh blood, new variations are promoted."

এই উভয়বিধ বিবাহের মিশ্রিত ফলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ শশধর বাবু বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান সমাজের আলোচনা করিয়াছেন। (মানবসমাজ, ৪৪ পৃঃ হইতে ৪৬ পৃঃ)। তিনি বলেন, "বাঙ্গালী জাতি বিদ্যাবুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তিতে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে কেন? ইহার অন্য যত প্রকার কারণই থাকুক জীব বিজ্ঞানানুমোদিত কারণই প্রধান।" তৎপরে বঙ্গের ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণের দেহে দ্রাবিড়ী ও মঙ্গোলীয় রক্ত আছে, ইতিহাস ও লোক তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি বলেন, "তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে বঙ্গীয়গণের দেহে দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় ও আর্য্য শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে। তাই বঙ্গীয় সমাজ কিছু বিশেষ ভাবে বহির্জাতীয়

সম্বন্ধের ফল মনে করা যায়। উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে প্রতিভা শক্তি ও মানসিক বলের অন্য কারণ অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন, ইহাতে প্রচুবরূপে বুঝা যায় যে এজাতি ভারতবর্ষে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেই। এই মিশ্রিত অবস্থা বঙ্গীয়গণের গৌরবজনক ভিন্ন কোন মতেই গৌরবের ক্ষতিকর নহে।"

ইহার পরের প্যারায় তিনি বলিতেছেন, "এক্ষণে এতদ্দেশীয় মুসলমান সমাজের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মনে উদয় হয় যে ইহারা কে? ইহারাত হিন্দুই। যে জাতি দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় ও আর্য্যরক্ত সম্ভূত, ইহারাত সেই জাতিরই নানা বর্ণের মিশ্রণ। তাহার উপরিও কোন স্থলে আরবীয়গণের রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদিগের প্রাধান্যও এই দিক্ হইতে দেখিলে দুর্ব্বোধ্য হয় না। ইংলণ্ডীয় জনগণের শিরায় শিরায় কত মিশ্র রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। মানবসমাজের ইতিহাস ও লোকতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে উপরের লিখিত মতে বহির্বিবাহ যে জাতির শক্তি সঞ্চয়ের একটি প্রধান উপায়, ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন হয় না।" শশধর বাবু বাঙ্গালী মুসলমানের দেহে যে আরব শোণিত মিশ্রিত বলিযাছেন, তাহা অপেক্ষা পারসিক ও আফগান শোণিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত আছে এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে তুর্কি শোণিতেরও সংস্রব আছে।

হিন্দু যতদিন পর্যন্ত স্থিতিস্থাপক হিন্দু থাকিবেন, কস্মিন্ কালে সুপ্রজনন বিদ্যার দ্বারা লাভবান্ হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ। ইহা নিশ্চয় যে Patel-এর আন্তর্জাতিক হিন্দুবিবাহ বিষয়ক বিল ভূপেন্দ্র বাবুর হিন্দুবিবাহ বিলের অদৃষ্টভাগী হইবে। বঙ্গবাসী মুসলমান ঈরাণী, আফগানী, পাঞ্জাবী, তুর্কী বা আরবী মুসলমানের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। কেবল মুসলমান নহে, খ্রীষ্টান বা য়িহুদীর সহিত বিবাহ ইস্‌লাম সঙ্গত। এইরূপ বহির্জাতিক বিবাহ দ্বারা মুসলমানের আকৃতি প্রকৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইবার আশা আছে।

শশধর বাবু বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, বাঙ্গালী মুসলমান সম্বন্ধে তাহা অধিক উপযুক্তরূপে প্রযুজ্য —"এ জাতি ভারতবর্ষে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেই।"*

পৃথিবীর কোনও জাতি যদি ধর্মতঃ পানদোষবিহীন হইতে বাধ্য থাকে, তবে সে মুসলমান জাতি। এরূপ সর্বদা মাদকবর্জিত ধর্ম আর নাই। তান্ত্রিক হিন্দুর মদ্য ব্যতীত পূজা হইতেই পারে না। X'mas-এর Eucharist উৎসবে প্রত্যেক খ্রীষ্টান খ্রীষ্টের রক্তের রূপকরূপে মদ্য পান করিতে বাধ্য। য়ূরোপ আমেরিকার শত সহস্র পানদোষনিবারণী সভা যে পানদোষ নিবারণ করিতে অক্ষম হইতেছে, ইস্‌লাম তাহা নিবারণ করিতেছে। যদি মুসলমান মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে, সে তাহার ধর্মের বিরুদ্ধে করে এবং তাহার বিবেক তাহাকে দংশন করিবে। কিন্তু সুরাপায়ী খ্রীষ্টানের বিবেক বলিয়া দিবে, Saint Paul বলিয়াছেন "Drink a little wine for your health's sake."

* প্রথম মহাযুদ্ধের পব পবই লেখা সুচিন্তিত এই প্রবন্ধে ডকটব সাহেব যে সমাজ ও জাতিগত দূবদর্শী মনোভাবেব পরিচয় দিয়াছিলেন, আজ প্রায় তেতাল্লিশ বছর পর তাঁহাব ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হইতে চলিযাছে। বাঙ্গালী মুসলমান পাক-ভারত উপমহাদেশে নিজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এবং সচেতন ও সক্রিয় মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। —প্রকাশক।

যদি খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করা যায়, দেখা যায় মুসলমান মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করেন। ইহাই যে মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, এ বিষয়ে ডাক্তারগণ একমত। কিন্তু খাঁটী বৌদ্ধ মাংস ভোজন করিতে পারে না। হিন্দুর খাদ্যের মধ্যে গো ও কুক্কুট মাংসের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য না থাকায়, সামান্য পীড়া কিংবা বিদেশ গমন উপলক্ষে তাঁহারা ধর্মের বিধান ভঙ্গ করিয়া পতিত হইতে বাধ্য হন। মুসলমানকে বাধ্য হইয়া অখাদ্য ভোজন করিতে হয় না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য জাতীয় আদর্শ, সামাজিক আদর্শ, রাষ্ট্রীয় আদর্শ কিংবা ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার বিষয়ে মুসলমানকে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টানের সহিত তুলনা করিলে, মুসলমানের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছান্ন কে বলিবে? কুর্‌আন জলদ গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন "লা তাক্‌নাতু মির্ রহ্‌মতিল্লাহ্" আল্লাহের অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। এস. হৃদয় বাঁধ, সাহস করিয়া অগ্রসর হও, ভবিষ্যতে তোমরাই জয়ী হইবে। "ফীকা দাউকা ওয়া দাওয়াউকা"— তোমারই মধ্যে রোগ ও তোমাদের মধ্যে ঔষধ। তোমাকে প্রথমে তোমার কুর্‌আনকে অবলম্বন করিতে হইবে —"ওয়াতাসিমূ বিহব্‌লিল্লাহি জমী'আ '— তোমরা সকলে একত্রে আল্লাহের রশিকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন কর। তৎপরে "ওয়া লা তফর্রকূ — এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হইও না এবং অবশেষে "ওয়া লা তমূতুন্না ইল্লা ওয়া আন্‌তুম্ মুস্‌লিমূন"— মুসলমান অবস্থার ভিন্ন মৃত্যুগ্রস্ত হইও না। "ওয়া লা তহিনূ ওয়া লা তহ্‌যনূ ওয়া আন্‌তুমুল্ 'আলাওনা ইন্ কুন্‌তুম্ মু'মিনীন"— তোমরা হীন হইও না, শোক করিও না. তোমরাই উন্নত হইবে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ ঃ আল্ এস্‌লাম — ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা. ১৩২৫ ॥

জাতির উত্থান ও পতন

সকলেই বলেন, জাতির উন্নতির জন্য চাই শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও সামরিক শক্তি। কথাটা সত্য ; কিন্তু ইহা কি ষোল আনা সত্য ? প্রাচীন মিসর, আসিরিয়া, মোহেনজোদাড়ো, গ্রীস ও রোমে এই সবই ছিল। কিন্তু কোথায় আজ তাহারা? কেন তাহারা ধ্বংস হইল? আল্লাহ্‌তা'আলা বলিতেছেন —

"অনন্তর কত না নগরকে আমি ধ্বংস করিয়াছি। তাহারা ছিল অত্যাচারী। অনন্তর সে সমস্ত ছাদ সমেত ভূমিসাৎ হইয়াছে। কত না আছে পরিত্যক্ত কূপ আর কত না উচ্চ দুর্গ।" (সূরাঃ হজ্জ, ৪৫ আয়াত)

সুখসমৃদ্ধিশালী সবা নগরের ধ্বংস বর্ণনা করিয়া কুরআন বলিতেছেন —

"এবং তাহারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। অনন্তর আমি তাহাদিগকে কাহিনী করিয়াছি এবং তাহাদিগকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছি।"

(সূরাঃ সবা, ১৯ আয়াত)

উন্নতির সমস্ত জাগতিক (Material) কারণের সঙ্গে যদি আধ্যাত্মিক (Moral and spiritual) কারণ না থাকে, তবে সে উন্নতি কখনও স্থায়ী হইতে পারে না একটি নধর সবুজ গাছের যদি মূল শিকড় কাটিয়া দেওয়া যায়, গাছ কয়েক ঘণ্টা বা দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তারপর কিন্তু সে শুকাইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। জাগতিক উন্নতিও এইরূপ।

"এবং আল্লাহ্ একটি নগরের দৃষ্টান্ত দিতেছেন। সে ছিল নিরাপদ ও নিরুদ্বেগ, সকল স্থান হইতেই তাহার জন্য উপজীবিকা আসিত। অনন্তর নগরবাসিগণ আল্লাহের অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইল। ফলতঃ তিনি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোষাক পরাইয়া মজা চাখাইলেন।" (সূরাঃ নহল, ১০২ আয়াত)

নানাবিধ দুষ্কর্মের ফলে যে জাতির নানা দুঃখ কষ্ট ঘটে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত প্রামাণ্য হাদীস হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।—

'কোনও জাতির মধ্যে যখনই সরকারী মালের খেয়ানত হইতে থাকে, অবশ্যই তাহাদের অন্তরে শত্রুর ভয় ঢুকিয়া যায়। যখনই কোনও জাতির মধ্যে ব্যভিচার ছড়াইয়া পড়ে, অবশ্যই তাহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া যায়। যখনই কোনও জাতি মাপ ও ওজন কম দিতে থাকে, তাহাদের জীবিকা কম হইয়া যায়। যখনই কোনও জাতি অন্যায় ভাবে বিচার করিতে থাকে, তাহাদের মধ্যে হত্যা কাণ্ড বাড়িয়া যায়। যখনই কোনও জাতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে থাকে, তাহাদের উপর শত্রু প্রবল হয়।" (হয্‌রত ইব্‌নে 'আব্বাস হইতে বর্ণিত ইমাম মালিকের মুআত্তা)

কমিউনিষ্টদিগের ন্যায় নাস্তিক ও পাপাচারী জাতিদের সাময়িক উন্নতি দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত মনে করে যে, ধর্ম্মের আবার প্রয়োজন কি? যদি আল্লাহ্ থাকেন, তবে ইহাদেব শাস্তি হয় না কেন? ইহার উত্তর স্বরূপে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—

"যখন কোন জনপদে আমি ধর্ম্মেব সংবাদবাহক (নবী) পাঠাই, তখন তাহার (পাপী) অধিবাসিগণকে দুঃখ ও কষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করি, যেন তাহারা বিনত হয়। অতঃপর (তাহাদের অবাধ্যতা সত্ত্বেও) আমি অকল্যাণেব পরিবর্ত্তে কল্যাণ দান করি, এমন কি তাহারা সমৃদ্ধি লাভ করে। তখন তাহারা বলে, আমাদের বাপদাদাদিগকেও তো কষ্ট ও সুখ স্পর্শ করিয়াছিল। তখন আমি হঠাৎ তাহাদিগকে এমন ভাবে পাকড়াও করি যে, তাহারা জানিতেও পারে না। আহা! যদি জনপদের অধিবাসিগণ ধর্ম্মবিশ্বাসী হইত এবং ধর্ম্মভীরু হইত, তবে নিশ্চয় আমি তাহাদের জন্য আসমান জমীনের সমস্ত মঙ্গল (বরকত) উন্মুক্ত করিয়া দিতাম। কিন্তু তাহারা (ধর্ম্মকে) মিথ্যা বলিয়াছিল। ফলতঃ, তাহাদের অর্জিত কর্ম্মের জন্য আমি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম।" (সূরাঃ 'আরাফ, ৯৪—৯৬ আয়াত)

এই সমস্ত সত্যতা-গর্বিত উদ্ধত পাপাচারী জাতিকে আল্লাহ্‌তা'আলা খবরদার করিয়া বলিতেছেন—

'কি! জনপদবাসিগণ নির্ভয় হইয়াছে যে আমার শাস্তি রাত্রিকালে, যখন তাহারা নিদ্রিত, তাহাদিগকে পৌঁছিবে না? কি! জনপদবাসিগণ নির্ভয় হইয়াছে যে আমার শাস্তি প্রাতঃকালে, যখন তাহারা খেলাধূলায় রত, তাহাদিগকে পৌঁছিবে না? কি! তাহারা আল্লাহের চক্রান্ত হইতে নির্ভয় হইয়াছে? অনন্তর যে জাতি বিনাশ পাইবে, তাহারা ভিন্ন কেহই আল্লাহের চক্রান্ত হইতে নির্ভয় হয় না।" (ঐ ৯৭—৯৯ আয়াত)

গত মহাযুদ্ধে জর্মানি, ইতালি ও জাপানের আকস্মিক পতন মহাকুরআনের বাণীর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়াছে। নূতন পাকিস্তানী জাতির ইহাতে শিখিবার ও ভাবিবার অনেক কথা আছে। আল্লাহ্‌তা'আলা মুসলমান জাতিকে বলিতেছেন—

"এবং নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্বে বহু যুগের লোককে আমি ধ্বংস করিয়াছি, যখন তাহারা অত্যাচারী হইয়াছিল, এবং তাহাদের প্রেরিতপুরুষ-(রসূল)গণ স্পষ্ট প্রমাণ সহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বিশ্বাসী হইবার পাত্র ছিল না। অতঃপর তাহাদের অন্তে আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি, যেন আমি দেখি তোমরা কেমন আচরণ কর।" (সূরাঃ য়ূনুস, ১৩-১৪ আয়াত)

প্রথম প্রকাশ ॥ মাহে নও. ২য় বর্ষ. ৫ম সংখ্যা. ভাদ্র. ১৩৫৭ ॥

মুসলিম পারিবারিক আইন ও নারী কল্যাণ

মানবদেহে যেমন দুই চোখ, দুই হাত, দুই পা; সমাজদেহে তেমনি নর ও নারী। যে দেহে এক চোখ কানা, এক হাত নুলা, এক পা খোঁড়া সে দেহ বিকলাঙ্গ। নারী জাতির সুষ্ঠু উন্নতি ব্যতীত সমাজকে সমুন্নত বলা যায় না। ইহা অত্যন্ত আশাপ্রদ যে, আমাদের সদাশয় জাতীয় সরকার এই নারী কল্যাণের প্রতি অবহিত হইয়াছেন। মুস্‌লিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্‌সে মুস্‌লিম নারীকে অহেতুক তালাকরূপ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত এবং সতিনীরূপ ঘরের বাঘিনীর কবল হইতে রক্ষার জন্য বিধান করা হইয়াছে। যদি জমি-জমা কেনা বেচার জন্য দলিল ও রেজিষ্টারির প্রয়োজন হয়, তবে বিবাহের বেলা তাহাতে দোষ হইবে কেন? ইহাতে বিবাহ বিভ্রাট বন্ধ হইবে।

সমাজ জীবনের জন্য যেমন বিবাহের প্রয়োজন, সেইরূপ কোনও কোনও অবস্থায় একাধিক (ইস্‌লাম অনুযায়ী ৪ পর্য্যন্ত) বিবাহেরও প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু তাহা খামখেয়ালী হইলে অনেক অকল্যাণ হইতে পারে। সেই জন্য বহুবিবাহ সম্বন্ধে যে বিধান কবা হইয়াছে, তাহাকে অন্যায় বলা চলে না। কিন্তু যদি কেহ বিবাহের ঝঞ্ঝাটে না গিয়া উপপত্নী রাখে, তবে তাহার প্রতিবিধান কি? দুঃখের বিষয় একটি বিঘোষিত ইস্‌লামী রাষ্ট্রে এই প্রশ্ন করিতে হইতেছে। ইস্‌লামের সর্ব্ববাদিসম্মত আইন এই যে ব্যভিচারের জন্য অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য শাস্তি ১০০ কশাঘাত এবং বিবাহিতদের জন্য প্রাণদণ্ড। আমাদের সরকার কি অবিলম্বে এই আইন প্রচলিত করিবেন ? যাঁহারা অর্ডিন্যান্‌স বহাল রাখিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারা কি এই ইস্‌লাম বিধান প্রবর্ত্তনের জন্য আওয়াজ উঠাইবেন না? তারপর হয়ত শরী'অতের দোহাই দিয়া কোনও প্রাচীনপন্থী অগণিত বাঁদী (দাসীপত্নী) রাখিবার জন্য ফতোয়া দিবেন। সেই জন্য এই বাঁদী প্রথাকেও বেআইনী ও দণ্ডনীয় বলিয়া বিধান করিতে হইবে। স্ত্রী বর্ত্তমান আইনে বড় জোর তিন সতীনের হাত হইতে রক্ষা পাইল বটে; কিন্তু অগণিত উপপত্নী ও বাঁদী (দাসীপত্নী) যে তাহার বুকে পিঠে শূল হানিতে লাগিল, ইহা কি তাঁহারা মৌনমুখে সহ্য করিবেন?

এখন তালাক সম্বন্ধে অর্ডিন্যান্‌স পরীক্ষা করা যাউক! ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে বহুবিবাহ অপেক্ষা তালাক নারী জীবনে সাংঘাতিক বিষময় পরিণাম আনে। আমি ইহাকে কেবল প্রাণদণ্ড অপেক্ষা কিছু কম মনে করি। এইজন্য হদীসে ইহাকে "আব্‌গযুল্‌ মুবাহাত" অর্থাৎ সমস্ত বৈধ কার্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত বলা হইয়াছে। যেমন প্রাণরক্ষার জন্য অঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন হইতে পারে, সেইরূপ

সামাজিক জীবন রক্ষার জন্য বিবাহবিচ্ছেদ। এই কারণে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সমাজে তালাক প্রথা না থাকিলেও প্রোটেষ্টান্ট সমাজে (বোধ হয় ইস্‌লামের দৃষ্টান্তে) ইহার বৈধতা স্বীকৃত হইয়াছে। বর্তমান ভারতীয় হিন্দু আইনে তালাক স্থান পাইয়াছে। বাস্তবিক তালাক অনেক স্থলে স্ত্রীর অপরাধের জন্য শাস্তিস্বরূপ। এইজন্য তাহা স্বামীর খামখেয়ালীর উপর ছাড়িয়া না দিয়া আদালতের উপর ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায় বা ইস্‌লাম বহির্ভূত নহে। কুর্‌আন শরীফে চোর ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আদালতের উল্লেখ নাই। অথচ এই সকল ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃকই শাস্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অর্ডিন্যান্‌সে বহুবিবাহের পূর্বে সালিসী পরিষদের রায় গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে; কিন্তু তালাকের জন্য সেরূপ করা হয় নাই। স্বামী নিজের মরজী মত তালাক দিতে পারে: কিন্তু সেই তালাক সালিসী পরিষদের আপস মিল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহা কার্যকর হইবে। অন্যথায় স্বামীস্ত্রীর মিলনে পর্যবসিত হইবে। কিন্তু ইহা এক তালাক বা দুই তালাক সম্বন্ধে শরী'অত সঙ্গত হইলেও তিন তালাক সম্বন্ধে শরী'অত বিরোধী হইবে। মোট কথা দৃশ্যতঃ অর্ডিন্যান্‌সে তিন তালাক বা তালাকে মুগাল্লাযাঃ স্বীকার করা হয় নাই। শরী'অত মতে ইহা তালাকুল্‌ বিদ্'আত এবং এইরূপ তালাক প্রদাণকারী পাপী ও শাস্তির যোগ্য। তৎসত্ত্বেও হানাফী এবং অপর তিন মযহব ইহার বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন। ইহার আবশ্যকতাও আছে; যেমন, স্ত্রীর ব্যভিচার যেখানে প্রমাণিত কিংবা যেখানে স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করিবার চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র করে, সেখানে একেবারে তিন তালাকই কর্তব্য। যাহা হউক অর্ডিন্যান্‌স ইহা স্বীকার না করায় কেবল যে শরী'অতের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহা নহে, স্বামী ও স্ত্রীকে হারামি কার্যে রত হইতে বাধ্য করা হইয়াছে। আমাব মনে হয় স্ত্রীকে স্বামীর খামখেয়ালী অন্যায় তালাক হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ আইনের প্রয়োজন, যথা—

১। যদি কোনও স্বামী আপন স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়, তবে কারণ নির্দেশ করিয়া চেয়ারম্যানের নিকট নির্দিষ্ট নিয়মে দরখাস্ত করিবে।

২। অর্ডিন্যান্‌সের বহুবিবাহ সম্বন্ধে ৬ (৩) ধারা এবং তালাক সম্বন্ধে ৭ (৪) ধারা অনুযায়ী গঠিত সালিসী পরিষদ্‌ বিচার করিয়া অনুমতি দিলে স্বামী তিন তালাক কিংবা এক বা দুই তালাক দিতে পারিবে।

৩। যদি স্বামী সালিসী পরিষদের রায় ব্যতীত পূর্বেই স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া থাকে, তবে সে স্ত্রীর নালিশ ক্রমে তালাকের ৭(২) ধারা অনুযায়ী এক বৎসর বিনাশ্রমে কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থ দণ্ড কিংবা উভয় শাস্তি ভোগ করিবে, কিন্তু তালাক বলবৎ হইবে। যদি সালিসী পরিষদ্‌ বিবেচনা করে যে স্বামী স্ত্রীকে ব্যভিচার বা স্বামীর হত্যা চেষ্টা বা অন্য ন্যায়সঙ্গত কারণে তিন তালাক দিয়াছে, তবে তালাক বলবৎ হইবে এবং স্বামী শাস্তি হইতে মুক্ত হইবে।

৪। যদি স্বামী পূর্বেই স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক দিয়া থাকে, তবে তালাকের ৭(৪) ধারার সালিসী পরিষদ্‌ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মিলনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে, ঐ তালাক বলবৎ হইবে।

৫। ইদ্দত গণনা তালাক দানের তারিখ হইতে হইবে। গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভমোচনের সঙ্গে ইদ্দত শেষ হইবে। অর্ডিন্যান্‌স অনুযায়ী এরূপ ক্ষেত্রে ৯০ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন কুরআন শরীফের খেলাপ। (দ্রষ্টব্য সূরা ঃ আততলাক, ৪ আয়াত)।

আমার মনে হয় নারীদিগকে অন্যায় তালাক এবং সপত্নীর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোনও অর্ডিন্যান্‌সের প্রয়োজন ছিল না। শরী'অতে তালাকে তফ্‌ভীযের ব্যবস্থা আছে। যদি স্বামী কাবিননামায় স্ত্রীকে তালাক দানের ক্ষমতা শর্তসহ সমর্পণ করেন, তবে প্রয়োজন হইলে স্ত্রী নিজের উপর তালাক লইতে পারেন কিংবা স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিলে, তাহাকেও তালাক দিতে পারেন। তবে এই সকলের জন্য উপযুক্ত আদালতের রায় গ্রহণ প্রয়োজন হইবে। এই অর্ডিন্যান্‌সের অন্যান্য বিধান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অন্যত্র প্রকাশিত হইবে।

যাঁহারা ইস্‌লামের দোহাই দিয়া নারীজাতির উপর পুরুষের স্বেচ্ছাচারমূলক অন্যায় অত্যাচারকে কায়েম রাখিতে চান, তাঁহাদিগকে আমি কেবল নারীজাতির শত্রু বলিব না, বলিব ইস্‌লামের শত্রু। কেহ কেহ বলেন, যখন ইস্‌লামে বহুবিবাহ এবং তালাকের অধিকার পুরুষকে দেওয়া হইয়াছে, তখন ইহাদের জন্য রোক টোক সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ? আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের অধিকারের লাপরোয়া ব্যবহার ইস্‌লামের নীতি নয়। তোমার অর্থ আছে, তুমি তাহা যথেচ্ছভাবে, যে কোনও কার্যে ব্যয় করিতে পার না। প্রয়োজনের অনুরোধে কুর্‌আন মজীদে বহুবিবাহের (৪ পর্যন্ত) অধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনেব অনুরোধে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টান ধর্মে ইসলামের তালাক প্রথা গৃহীত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিবা বহুবিবাহকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় তাহাদের মধ্যে যৌন-অরাজকতা বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু ইস্‌লামেব আদর্শ যে এক বিবাহ এবং তালাকের অবাঞ্ছনীয়তা বা ঘৃণ্যতা, তাহা কুর্‌আন ও হদীস হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

যেখানে কুর্‌আনে (সূরাঃ নিসাঅ, আয়ত ৩) বলা হইয়াছে "এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর, যে অনাথদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে তোমরা নারীদের মধ্যে তোমাদের যাহা ভাল লাগে দুই, তিন বা চারি বিবাহ কর," তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে, "অনন্তর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে তোমরা সমান ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক (স্বাধীনা) নারীকে কিংবা যাহা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত অধিকারী হইয়াছে, এমন (কৃতদাসীদিগকে) বিবাহ কর। ইহা অন্যায় আচরণ না করার অতি নিকটবর্তী।" এই আয়ত উহুদ যুদ্ধের পরে যাহাতে ৭০ জন শহীদ হয়, মুসলমান সমাজে বিধবা ও অনাথার সমস্যা সমাধানের জন্য নাযিল হয়। স্ত্রীগণের প্রতি যে সমান ব্যবহার সম্ভবপর নয়, তাহা কুর্‌আন শরীফ আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন — "এবং কিছুতেই তোমরা স্ত্রীগণের মধ্যে সমান ব্যবহার করিতে পারিবে না, আর যদিও তোমরা তাহার জন্য লোলুপ হও।" (সূরাঃ নিসাঅ, আয়ত ১২৯)। বুখারী শরীফে আমরা দেখি, যখন বনী হিশাম বিন্ মুগায়রাঃ (রাঃ) নিজ কন্যাকে হয্‌রত 'আলীর (রাঃ) সহিত বিবাহের অনুমতি রসূলুল্লাহের (দঃ) নিকট

প্রার্থনা করেন, তখন তিনি বলেন, "আমি অনুমতি দেই না, আমি অনুমতি দেই না, আমি অনুমতি দেই না ; হাঁ, তবে যদি আবু তালিবের বেটা আমার বেটীকে তালাক দেয়, আর তোমার বেটীকে শাদী করে। কেননা ফাতিমাঃ আমার কলেজার টুকরা ; তাহাতে যে মন্দ পৌছে, তাহা আমাতে পৌছে, আর তাহাতে যে কষ্ট হয়, সে কষ্ট আমাতে হয়।" (কিতাবুন নিকাহ)। অন্য স্থলে আমরা পাই যে যখন হয্‌রত 'আলী (রাঃ) আবু জহলের কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করেন, তাহা শুনিয়া হয্‌রত ফাতিমাঃ রসূলুল্লাহের (দঃ) নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করেন। তখন আঁ হয্‌রত বলেন, "ফাতিমাঃ নিশ্চয় আমার গোশ্‌তের এক টুকরা। আমি কিছুতেই তাহা সহ্য করিব না, যাহাতে তাহার কষ্ট হয়। আল্লাহের কসম, রসূলের বেটী এবং তাহার শত্রুর বেটী একই লোকের কাছে থাকিতে পারে না।" ইহাতে হয্‌রত 'আলী বিবাহ প্রস্তাব ত্যাগ করেন। (কিতাবুল্ মুনাকিব)।

উপরি উদ্ধৃত দুইটি সহীহ্ হদীস হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে কন্যার মনঃকষ্টের জন্য আঁ হয্‌রত হয্‌রত 'আলীকে দ্বিতীয় বিবাহ নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক মুসলিম নারী কি রসূলুল্লাহের নিকট তাঁহার কন্যার ন্যায় নয়? তালাক সম্বন্ধে তো রসূলুল্লাহের (দঃ) বিখ্যাত হদীস আছে "সমস্ত বৈধ কার্য্যের মধ্যে যাহা আল্লাহের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত তাহা তালাক" (আবু দাঊদ, ইব্‌ন মাজাঃ এবং হাকিম, ইব্‌ন 'উমর হইতে বর্ণিত)। সুতরাং বহুবিবাহ ও তালাক সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ রচনা ইস্‌লাম নীতি-বহির্ভূত হইবে কেন? প্রত্যেক সন্ধ্যায় এক নূতন বিবাহ এবং প্রত্যেক সকালে তাহাকে তালাক দিয়া "তাযাহ্ ব-তাযাহ্ নও বনও" ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে রত হওয়া বা তাহার ফতোয়া দেওয়া আরব্য উপন্যাসের শাহরিয়ার বাদ্‌শাহের প্রত্যেক রাত্রিতে নূতন বিবাহ এবং সকালে সেই স্ত্রীর প্রাণদণ্ডের ন্যায় কি ধর্মের এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর উপহাস বোধ হইবে না? নারীজাতির যে একটি মন আছে, তাহা কি ভুলিবার বিষয় ?

প্রথম প্রকাশ ॥ মহিলা, ১ম বর্ষ, ১৩৬৯, ২১ সংখ্যা ২৪-৯-১৯৬২ ॥

ইস্‌লামে রাষ্ট্রের স্বরূপ

ইসলাম কেবল স্বর্গের পথ দেখায় নাই। ইসলাম মানুষকে সর্ববিধ পার্থিব উন্নতিব পথও দেখাইয়াছে। মুসলমানের প্রার্থনা কেবল ইহা নয় যে মরণেব পরে পরলোকে সে মঙ্গল লাভ করুক, তাহার প্রার্থনা — "ফিদ্দারয়নি খযবান"— ইহ-পরলোকে মঙ্গল, "রব্বানা আতিনা ফি-দ্দুনিয়া হসনতাউঁ ওযা ফিল-আখিরতি হসনঃ"— হে আমাদের রব্ব (প্রভু), তুমি আমাদিগকে পৃথিবীতে কল্যাণ এবং পবলোকে কল্যাণ দান কর (কুর্‌আন)। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কেবল একটি ধর্মস্থাপন কবেন নাই, তিনি একটি রাষ্ট্র ও একটি জাতিরও ভিত্তি স্থাপন কবেন। "By a fortune absolutely unique in history Muhammad is the threefold founder of a religion, a state and a nation." (*Bosworth Smith, Life of Muhammed*).

যখন সমস্ত দুনিয়ায রাজপূজা ও রাজভক্তিব স্রোত বহিতেছিল, তখন সহসা আল্লাহের নবী বজ্রগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করেন —

"পরলোকে আল্লাহের নিকট লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধগ্রস্ত ও সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যাহার রাজাধিরাজ নাম রাখা হয়। আল্লাহ ভিন্ন কোনও রাজা নাই।" (মুসলিমের হদীস)

এই "লা মালিক ইল্লাল্লাহ"— আল্লাহ্ ভিন্ন কোনও বাজা নাই— বাণী এক নিমেষে রাজতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিল। আল্লাহের রাজত্ব অর্থে পুরোহিততন্ত্র নয়। তাহার অর্থ দেশ, বংশ ও বর্ণ নিরপেক্ষ মানুষেরই রাজত্ব। শেষ হজ্জের শুভ শুক্রবার দিন আরফাতের পবিত্র ভূমিতে রসূলুল্লাহের ঘোষণায় ইহা স্পষ্ট ব্যাখ্যাত হইয়াছে —

"হে লোক সকল, তোমাদের প্রভু এক (আল্লাহ)। তোমাদের পিতা এক। তোমরা সকলে আদমের সন্তান আর আদম মাটি হইতে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে সেই অধিক সম্মানিত, যে অধিক ধার্মিক। না কোনও আরবের অন্-আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব আর না কোনও অন্-আরবের আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ধার্মিকতায়।"

কুর্‌আনে আদমকে পৃথিবীতে আল্লাহের খলীফাঃ বা প্রতিনিধি বলা হইয়াছে (সূরাঃ বকরাঃ)। আল্লাহ আদমকে সেই স্বর্গোদ্যানে রাখিয়াছিলেন যেখানে —"নিশ্চয় তোমার জন্য সেখানে না আছে ক্ষুধা আর না আছে নগ্নতা। আর এই যে সেখানে না তুমি তৃষ্ণার্ত হইবে আর না তুমি রৌদ্রতাপ ভোগ করিবে।" (সূরাঃ তাহা)

"শান্তি! শান্তি! (সলাম) বাণী ব্যতীত তাহারা সেখানে কোনও বৃথা বাক্য বা পাপ বাক্য শুনিবে না।" (সূরাঃ ওয়াকিআঃ)

"আমি (আল্লাহ্‌) তাহাদের অন্তরে যে কিছু ঘৃণা বিদ্বেষ থাকিবে, তাহা দূর করিয়া দিব। তাহারা ভাই ভাই হইয়া উচ্চাসনে মুখামুখি হইয়া বসিবে।"

(সূরাঃ হিজর)

স্বর্গোদ্যানের এই সকল বর্ণনার অর্থ এই যে আল্লাহের প্রতিনিধিরা পৃথিবীতে এই স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবে এবং সেই শিক্ষা দানের জন্যই মানবের আদি পিতামাতা আদম ও হাওয়াকে স্বর্গোদ্যানে রাখা হইয়াছিল।

শাসনকর্তারা যুগে যুগে স্বেচ্ছাচারী হইয়া কিংবা মানুষের গড়া আইনের জোরে পৃথিবীতে কত না অশান্তি, কত না নরক সৃষ্টি করিয়াছে! জগতের শাসনতন্ত্রের ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য প্রয়োজন যে আল্লাহের আইনের দ্বারা আল্লাহের প্রতিনিধিরা পৃথিবী শাসন করিবে।

"হে দাঊদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলীফাঃ) করিয়াছি। অতএব ন্যায্যভাবে মনুষ্যের মধ্যে বিচার কর। প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। তাহা হইলে ইহা তোমাকে আল্লাহের পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। অনন্তর যাহারা আল্লাহের পথ হইতে বিচ্যুত হয়, তাহারা কঠিন শাস্তি ভোগ করে, যেহেতু তাহারা হিসাব নিকাশের দিনকে ভুলিয়া যায়।" (সূরাঃ সাদ)

"আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহারা তাহাদ্বারা বিচার করে না, তাহারাই অত্যাচারী।" (সূরাঃ মাইদাঃ)

"তাহারা কি অজ্ঞানতার যুগের বিচার চায়? নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী, সেই জাতির জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম বিচারক কে আছে?" (ঐ)

যেহেতু আল্লাহ "রব্বুল 'আলামীন" (বিশ্বজগতের প্রভু), বিশেষ কোনও দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা বর্ণের প্রভু ন'ন, কেবল মানুষেরই প্রভু ন'ন, এই জন্য আল্লাহের প্রতিনিধিরা সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের হিত সাধন করিবেন, বিচারে কোনও পক্ষপাত করিতে পারিবেন না। আঁ হয্‌রত (দঃ) বলিয়াছেন—"আন্‌ নাসু সওয়াসিয়াঃ" মানুষ সব সমান। পুনশ্চ "সকল সৃষ্টি আল্লাহের পরিজন, যে তাঁহার পরিজনের অধিক হিতকারী সে-ই তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহের অধিক প্রিয়।" "উৎপীড়িতের আর্তনাদ হইতে সাবধান হও, যদিও সে কাফির হয়।" "যে ব্যক্তি কোনও যিম্মীকে (মুসলমান রাজ্যের অমুসলমান প্রজাকে) কষ্ট দেয়, সে আমাকে (রসূলুল্লাহকে) কষ্ট দেয়।"

খলীফাঃ 'উমর ইব্‌ন 'আব্‌দিল্‌ 'আযীযের সময় হইতে প্রতি জুমু'আর খুত্‌বায় যে আল্লাহের বাণী ঘোষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা যেমন সার্বজনীন, তেমনই ব্যাপক— "নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আদেশ করেন ন্যায় বিচারের, পরোপকারের, এবং আত্মীয়গণের প্রতি দানের, এবং নিষেধ করেন কুকর্ম, ঘৃণিত কার্য এবং অত্যাচার (বা বিদ্রোহিতা)। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা মনোযোগ দাও।" (সূরাঃ নহল)

দুই শতাব্দীর গোলামীর পরে আমরা আযাদ পাকিস্তান পাইয়াছি। আল্লাহ আমাদিগকে বলিতেছেন "নিশ্চয় তোমাদের পূর্বের বহু যুগের লোকদিগকে, যখন

তাহারা অত্যাচারী হইয়াছিল, আমি ধ্বংস কবিয়াছিলাম। * * * অনন্তর তাহাদের পরে আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছি। এই জন্য যে আমি দেখিতে চাই তোমরা কেমন কার্য্য কর।" (সূরাঃ য়ূনুস)।

"তিনিই যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে অন্যের উপর পদমর্যাদা দিয়াছেন, এইজন্য যেন তিনি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন।"

(সূরাঃ আন্‌'আম)।

পৃথিবীতে শয়তানের রাজত্ব ঘুচাইয়া আল্লাহের রাজত্ব স্থাপন, পৃথিবীতে স্বর্গের শান্তি, আনন্দ ও ঐশ্বর্য আনয়ন; সংক্ষেপে ইহাই ইস্‌লামে রাষ্ট্রের স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে আমরা নেপোলিওঁর কথা স্মরণ করিতে পারি —"আমি আশা কবি সে দিন দূরবর্তী নয়, যখন আমি সকল দেশের সকল জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকদিগকে সম্মিলিত করিয়া কুর্‌আনের মতবাদের উপর— যাহা একমাত্র সত্য এবং যাহা একমাত্র মনুষ্যজাতিকে সৌভাগ্য দান করিতে পারে, এক সর্বতোভাবে সমান শাসন প্রণালী স্থাপন করিতে পারিব।"* যাহা নেপোলিওঁ পারেন নাই, ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা আযাদ পাকিস্তানে তাহা পারিব।

* "J'espere que le moment ne tardera pas ou je pourrai reunir tous les hommes sages et instruits du pays, et etablir un regime uniforme fonde sur les principes de l' Alcoran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonbeur des hommes" (*Bonaparte et L' Islam par Christian Cherfils*)

প্রথম প্রকাশ ॥ মাহে-নও, শ্রাবণ, ১৩৫৬, আগষ্ট, ১৯৪৯ ॥

ইস্‌লামী সমাজের রূপ

বস্‌ওয়ার্থ স্মিথ তাঁর 'Life of Mohammed'-গ্রন্থে বলেছেন, "মুহম্মদ (দঃ) এমন এক ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন যাহা ইতিহাসে অপূর্ব। একাধারে তিনি ত্রিগুণবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা একটি জাতির, একটি সাম্রাজ্যের ও একটি ধর্মের।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন নি, প্রতিষ্ঠা করেছেন ভ্রাতৃত্ব। আর সে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ মানবতা। তৌহীদ, আল্লাহের রবুবিয়াত এবং সাধারণ মানবীয় উৎপত্তিগত প্রকৃতির বুনিয়াদেই গ'ড়ে উঠেছে এ আদর্শ। আল্লাহের রবুবিয়াত বলতে তাঁর তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝায় ঃ তিনি স্রষ্টা, তিনি প্রতিপালক, তিনি বিবর্তক। অনেকে মনে ক'রে থাকেন, রবুবিয়াতের অর্থ প্রভুত্ব; কিন্তু এ অনুবাদ ত্রুটিপূর্ণ। নবীজী হজ্জাতুল্ বিদা'-এ (শেষ হজ্জে) যে ভাষণ দান করেন, তাতে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে এ মর্মেই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন ঃ

> "হে মানব জাতি, নিশ্চয় তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতা এক। তোমাদের প্রত্যেকে আদম-সন্তান এবং আদম হচ্ছেন মৃত্তিকা হ'তে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌কে যে সর্বাধিক ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহের কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত। অন্-আরবগণের উপর আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব নাই; আরবগণের উপরও অন্-আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব নাই। কেবলমাত্র ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।" (হদীস)

নবীজী আরও বলেছেন; "মানুষ মানুষের ভাই" (হদীস)। তিনি এই বাণী আল্লাহের থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوْبًا
وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰيكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
خَبِيْرٌ ،

> "হে মানব জাতি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি; এবং যাতে তোমরা পরস্পরকে জানতে ও চিনতে পার, সে উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে গোষ্ঠী ও পরিবার হিসেবে গ'ড়ে তুলেছি। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহের কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।" (কুর্‌আন ঃ ৪৯ ঃ ১৩)।

সুতরাং ইস্‌লামী নীতি অনুসারে মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের এই আদর্শই হচ্ছে সমাজ-কাঠামোর ভিত্তি স্বরূপ। ভ্রাতৃত্বের এ আদর্শ বর্ণ, জাতি, শ্রেণী, ভাষা ও পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম ক'রে গেছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে এই মানবতাবাদ। শীরাজের মহাকবি সা'দী বলেছেন ঃ

"বনী আদম 'আযা-ই-য়ক দিগরন্দ,
কে দর্ আফ্রীনশ যে য়ক্ জওহরন্দ।
চুঁ 'উযুএ ব-দর্দ আওরদ রোযগার,
দিগর 'উযুহারা ন-মানদ করার।
তু কয্ মিহনত-ই-দিগরাঁ বে-গমী।
ন শায়দ নামত নিহন্দ আদমী।"

"মানব সন্তান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান,
একই বস্তু তাদের হয় উপাদান।
কালক্রমে এক অঙ্গে যদি হয় ব্যথা,
সকল অঙ্গেতে হয় ঘোর অস্থিরতা।
তুমি যদি পর-দুঃখে না হও দুঃখিত,
মানব তোমার নাম না হয় উচিত।"

এ ভ্রাতৃত্বে ছোট-বড় নেই, রাজা-প্রজা নেই। নবীজী বলেছেন ঃ "যাকে সবাই রাজার রাজা ব'লে অভিহিত করত, শেষ বিচারের দিন সে-ই হবে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক রোষের পাত্র ; আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই হবে সর্বাধিক দুষ্ট ব্যক্তি।" (হদীস ঃ মুসলিম)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র ইসলামেই পৌরোহিত্যবাদ নেই।

প্রাচীন বিশ্বে ক্রীতদাস-প্রথা ছিল, দাস-শ্রমিক প্রথাও ছিল। ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতি এ-সব কু-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। নবীজী বলেছেন ঃ

> "শেষ বিচারের দিন তিন প্রকার লোকের প্রতি আমি বৈরভাব পোষণ করব। তারা হচ্ছে, যে-ব্যক্তি আমার নাম নিয়ে মিথ্যে হলফ করে, যে-ব্যক্তি একজন স্বাধীন মানুষকে অন্যের কাছে বিক্রি ক'রে বিক্রির টাকা খায়, আর যে শ্রমিক নিযুক্ত ক'রে কাজ করিয়ে নিয়ে তাকে মজুরী দেয় না।" (হদীস ঃ বুখারী)

যে-দিন নবীজী বলেছিলেন, —'আমার ক্রীতদাস' অথবা 'আমার ক্রীতদাসী' একথা কারুর বলা অনুচিত; বরং বলা উচিত যে, 'আমার যুবক' বা 'আমার যুবতী'—প্রকৃতপক্ষে, সে-দিন থেকেই ইসলামে ক্রীতদাস-প্রথা উঠে গেছে। (হদীস ঃ বুখারী)। পবিত্র কুর্‌আনে ক্রীতদাসদেরকে মুক্তি অর্জনের জন্যে টাকা দিয়ে সাহায্য করার নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۝

"তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী, তারা মুক্তি-পত্র চাইলে তোমরা তা' লিখে দাও, যদি তোমরা এতে তাদের ভাল বোঝ; এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা' থেকে তাদেরে দাও।"

(কুর্‌আন ঃ ২৪ ঃ ৩৩)।

সেকালে ইসলামে যুদ্ধ-বন্দীদেরকে সাময়িকভাবে দাস ক'রে রাখা হ'ত। একে এক ধরনের যুদ্ধ-কালীন বন্দিত্বও বলা যেতে পারে। তারপর তাদেরে বিনা পণে অথবা সামান্য পণে মুক্তি দেয়া হ'ত। পবিত্র কুর্‌আনে বলা হয়েছে ঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

"যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, যতক্ষণ তোমরা তাদেরে পরাভূত না করছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বন্দী ক'রে রাখ। তারপর মহানুভবতা প্রদর্শন ক'রে অথবা মুক্তি-পণের বিনিময়ে ছেড়ে দাও এ পর্যন্ত যে যুদ্ধে তার অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে।" (কুর্‌আন ঃ ৪৭ ঃ ৪)।

Old Testament-এর Book of Genesis-এ আমরা পড়তে পাই, ঈভের প্ররোচনায় আদম নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন; আর তার ফলে তাদের উভয়কে ইডেন থেকে বিতাড়িত হ'তে হয়েছিল। ইহুদীরা এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মেয়েদেরকে হীনভাবে দেখত ও নিন্দা করত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, হাওয়া নন, শয়তানই আদম ও হাওয়া উভয়কে প্ররোচিত করেছিল।

মন ও শরীরের গঠনের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই নারী অপেক্ষা নর শ্রেষ্ঠ। এ-কথা অস্বীকার করার অর্থ প্রকৃতিকে অস্বীকার করা। তাই কুর্‌আনে পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেয়া হ'লেও মেয়েদেরকেও তাদের প্রাপ্য ন্যায়-সঙ্গত অধিকার দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুর্‌আনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"ন্যায়সঙ্গতভাবে মেয়েদেরও (পুরুষের) অনুরূপ অধিকার আছে। কিন্তু মর্যাদা পুরুষের তাদের অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। আল্লাহ্ শক্তিমান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন।" (কুরআন, ২ ঃ ২২৮)

আমার মনে হয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলোর ভিতর ইসলামই মেয়েদেরকে সম্পত্তি ও পরিবারগত অধিকার দিয়েছে। এমন কি, গত শতাব্দীর শেষভাগে পর্যন্ত বৃটিশ আইনেও এ অধিকার স্বীকৃত হয় নি। আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে মনু, মুসা, এমন কি ঈসা নবী পর্যন্ত কেউই বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেন নি। কিন্তু পবিত্র কুর্‌আনে বহুবিবাহকে সীমিত করা হয়েছে এবং এক বিবাহের প্রতি আনুকূল্য দেখানো হয়েছে। মুসলিম আইনে বিশেষ বিশেষ কারণে নারীর স্বামী-ত্যাগের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং একবিবাহ কার্যকর করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত

স্বরূপ কাবিন-নামার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বেশ্যাবৃত্তি অপেক্ষা নিঃসন্দেহে বহুবিবাহে অনিষ্ট অনেক কম। পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক, এগুলো চালু রয়েছে। মুসলমানই খোদাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে; আর তার পরেই দিয়েছে নারীর মর্যাদা।

খালিকস্ত আঁ গোয়া মখলূক নীস্ত্।
পারতও-ই-হকস্ত্ ওঅ আঁ মা'শূক নীস্ত্

'নহে সে তো সৃষ্টি, তারে স্রষ্টা অনুমানি,
নারী বিধাতার ছায়া, নহে সে কামিনী।' (রূমী)

সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যাপারে ইসলাম কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের মধ্যবর্তী ভারসাম্যমূলক বিধান দিয়েছে। পবিত্র কুর্‌আনে বলা হয়েছে ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥

"এ সংসারে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে অংশ ভাগ দিই, এবং মর্যাদার দিক্ দিয়ে তাদের অনেককে অন্যান্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দিই, যাতে ক'রে তারা (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা) অন্যান্যদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তোমার রবের দয়া তাদের সঞ্চিত সম্পদরাজি অপেক্ষা উত্তম। (কুর্‌আন, ৪৩ ঃ ৩২)।

আবার ঃ

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ٥

"আল্লাহ্ জীবিকার ক্ষেত্রে কাউকে অন্য অপেক্ষা অধিকতর অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু যারা অধিক অনুগ্রহ লাভ করেছে, তারা তাদের অধীনস্থদের পরিপোষণ করে না— পাছে তারাও তাদের সমান হ'য়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহের অনুগ্রহ অস্বীকার করে?" (কুর্‌আন, ১৬ ঃ ৭১)

ধনবান্ তার সম্পদের অংশ দিয়ে দরিদ্রকে নিজের সমপর্যায়শীল না করলে আল্লাহ্ তাতে নারাজ— এ কথাই এখানে বলা হয়েছে।

ইস্‌লাম সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অধিকার স্বীকার করে; সেই সাথে ইস্‌লাম মওজুদদারীর বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দাবাদে মুখর ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ نِ الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَه يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ٥

"আক্ষেপ তাদের জন্যে, যারা কুৎসা-রটনাকারী ও নিন্দুক এবং যারা মাল সঞ্চয় করে ও গণনা করে। তারা ভাবে যে, তাদের মাল তাদের অমর ক'রে রাখবে। কখনই নয়, তারা দারুণ ধ্বংসকর বিপর্যয়ে নিপতিত হবে।" (কুরআন, ১০৪ ঃ ১—৪)

শেষের কথায় পুঁজিবাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি, এতিম ও অভাবগ্রস্তদের জন্যেও যথোচিত ব্যবস্থা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
ط نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝

"মাতাপিতা বা নিকট আত্মীয় যা' রেখে যাবে, তাতে পুরুষদের অংশ থাকবে আর নারীদের জন্য মাতাপিতা বা নিকট আত্মীয় যা' রেখে যাবে, তাতে তাদের অংশ থাকবে, তা' সে সম্পত্তি ছোট হোক বা বড় হোক — নির্দিষ্ট এ অংশ থাকবেই। সেই সম্পত্তি বিভাগের সময়ে সেখানে যদি জ্ঞাতি, অনাথ অথবা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, তাহ'লে তা' থেকে তাদেরকে কিছু প্রদান কর এবং তাদের সাথে সদয় বাক্য ব্যবহার কর।" (কুর্‌আন, ৪ঃ ৭-৮)

এখানে লক্ষণীয় যে, উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তির পরিমাণ বেশী হোক আর কম হোক, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আইনানুগ বণ্টন ছাড়াও উত্তরাধিকারী নয়, এমন আত্মীয় ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের বিধানও রয়েছে।

সাধারণ মানুষের উপর শোষণ ও সুযোগ-শিকার চালানো বন্ধ করবার জন্যে কুর্‌আনে সকল রকম সুদ গ্রহণ ও জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইস্‌লাম বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) এবং স্বেচ্ছামূলক দানের (সাদাকাত) বিধানও দিয়েছে। এই সব বিধানের মাধ্যমে সম্পদের ন্যায়ানুগ বণ্টনের সাথে মিতব্যয়িতাও গ'ড়ে ওঠে।

কার্যকারিতার দিক্ দিয়ে ইস্‌লাম এমন একটি গণতান্ত্রিক শ্রেণীহীন সমাজ কল্পনা করে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি সুযোগ, সুবিধা ও সম্পদের ক্ষেত্রে তার ন্যায্য অংশ লাভ করবে। ইস্‌লামী দৃষ্টিকোণ থেকে "সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহের পরিবার, আর এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা হিতকারী ব্যক্তিই হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়।" (হদীস)

প্রথম প্রকাশ ॥ ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, এপ্রিল—জুন, ১৯৬১ ॥

নীতির মূলসূত্র

—পুণ্য, পাপ ও অপরাধ সম্পর্কে ধারণা

ইস্‌লামের উচ্চতর শিক্ষা এই যে বিশ্বজগতে মানুষ আল্লাহের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে আল্লাহের প্রতিনিধি। আল্লাহ্ মানুষকে আসমান-জমিনে সকল বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব দিয়াছেন এবং তাহাকে আধ্যাত্মিক এবং বাহ্য সম্পদে পূর্ণতা দিয়াছেন। আল্লাহতা'আলা সংসারে তাহার উপর বিশেষ কার্য্যভার সমর্পন করিয়াছেন, যাহার হিসাব নিকাশ তাহাকে পরলোকে তাঁহার নিকট তন্ন তন্ন করিয়া দিতে হইবে। কুর্‌আন বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً ط

"এবং (স্মরণ কর) যখন তোমাদের প্রতিপালক প্রভু স্বর্গীয় দূতগণকে বলিলেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব।" (বকরাঃ, ৩০)।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

"এবং নিশ্চয় আমি আদমের সন্তানকে সম্মানিত করিয়াছি এবং আমি তাহাদিগকে স্থলে ও সাগরে বহন করি, আর আমি তাহাদিগকে উত্তম জীবিকা দিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অধিকাংশের উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। (বনী ইস্রাঈল ঃ ৭০)।

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ط

"তোমরা কি বিবেচনা কর না যে আল্লাহ যাহা কিছু আসমান জমিনে আছে, তোমাদের জন্য বাধ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগ্রহকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক রূপে তোমাদের প্রতি পূর্ণ ভাবে দান করিয়াছেন?" (লুকমান, ২০)।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۝

"তোমরা কি গণনা কর যে আমি তোমাদিগকে অকারণ সৃষ্টি করিয়াছি আর এই যে তোমাদিগকে আমার দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে না?" (মু'মিনূন ১১৫)।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি কারণ এই যে সে স্বেচ্ছায় তাহার নিজের উপর কর্তব্য পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। সেই দায়িত্ব পালন না করিলে, সে আল্লাহের নিকট অপরাধী হইবে।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ط إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"নিশ্চয় আমি আমানতটিকে আসমান, জমিন, পাহাড়ের নিকট পেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা তাহা বহন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, কারণ তাহারা তাহা হইতে ভীত হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ তাহা বহন করিল। সে বাস্তবিক অত্যাচারী ও নির্বোধ হইয়াছে।" (আহ্‌যাব, ৭২)।

এই আমানত আমাদের কর্তব্য বিষয় (duty)। 'সে বাস্তবিক অত্যাচারী ও নির্বোধ হইয়াছে' — ইহার ব্যাখ্যা এই যে মানুষ স্বীয় কর্তব্য ভুলিয়া অত্যাচারী হয়।

কর্তব্য বা হিতাহিত জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত। আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"আত্মা এবং যাহা তাহাকে সুষ্ঠু করে, তাহাদের শপথ, অনন্তর তিনি তাহাকে তাহার পাপ ও তাহার পুণ্য তাহাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। নিশ্চয় সে সফল হইয়াছে, যে তাহাকে বাড়াইয়াছে আর সে বিফল হইয়াছে, যে তাহাকে গাড়িয়া ফেলিয়াছে। (শম্‌স, ৭-১০)।

إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

"নিশ্চয় আমি তাহাকে পথটি দেখাইয়াছি। হয় সে কৃতজ্ঞ, না হয় সে কৃতঘ্ন হউক।" (ইনসান, ৩)।

বারংবার পাপ কার্য্যদ্বারা বিবেক অন্ধ হইয়া যায়। কুরআন বলেন ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"না, না, বরং তাহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের হৃদয়ে মরিচা পড়িয়া গিয়াছে।" (তৎফীফ, ১৪)

অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়। এই অবস্থাকে কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

"আল্লাহ তাহাদের হৃদয়ে এবং কানে মোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চোখের উপর আছে ঠুলি।" (বকরা, ৭)।

এই অবস্থা নিরন্তর পাপ অভ্যাসের পরিণাম। কুরআন শরীফ আমাদিগকে সর্বদা বলিতেছেন ঃ

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

অনন্তর আল্লাহ্ এমন নহেন যে তাহাদের উপর কোনও অত্যাচার করেন, কিন্তু তাহারা নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল।" (তওবা, ৭০)।

দার্শনিক শোপেনহাওয়ার এইরূপ অবস্থায় বিবেক সম্বন্ধে বলেন তাহা ১/৫ লোকের ভয়, ১/৫ কুসংস্কার, ১/৫ মনের ভুল ধারণা (Prejudice), ১/৫ বৃথা গর্ব (Vanity) এবং ১/৫ আচার (Custom)। মানুষের নৈতিক দায়িত্বের মূলে তাহার জন্মতঃ নিষ্পাপ অবস্থা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা (freedom of will)।

ইস্‌লাম শিক্ষা দেয় যে মানুষ নিষ্পাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর শিক্ষার দোষে তাহার অবস্থান্তর ঘটে। ইহাকে আল্লাহ্-প্রদত্ত মনুষ্য-প্রকৃতি বলা হইয়াছে।

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط

"আল্লাহ-প্রদত্ত প্রকৃতি যাহার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহের সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই।" (রূম, ৩০)।

ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপে রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ "প্রত্যেক শিশু প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। তৎপরে তাহার মা বাপ তাহাকে য়িহুদী কিংবা খ্রীস্টান কিংবা পার্শী বানায়, যেমন প্রত্যেক জন্তু পূর্ণাঙ্গ হইয়া জন্মায়। তোমরা কি কোনও জন্তুকে হাত-পা ভাঙ্গা কিংবা বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মিতে দেখ?"

ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"এবং বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর নিকট হইতে। অতএব যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে কাফির হউক।" (কহফ, ২৯)।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ -

"আল্লাহ্ কোনও আত্মার উপর তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না। সে যাহা (ভাল) উপার্জ্জন করে, তাহা তাহারই, আর সে যাহা (মন্দ) অর্জ্জন করে, তাহা তাহারই বিরুদ্ধে।" (বকরা, ২৮৬)

কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহের আদেশ ও নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পালন করা পুণ্য বা সওয়াব এবং তাহা লংঘন করা পাপ বা ইস্‌ম। আমি এখানে একটি মাত্র উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

"এবং তোমার প্রতিপালক প্রভু নির্দেশ করিয়াছেন যে তোমরা তাঁহাকে ভিন্ন কাহারও পূজা করিবে না এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্‌ব্যবহার করিবে। যদি তাহাদের একজন কিংবা উভয়ে তোমার কাছে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়, তুমি তাহাদিগকে ধিক্ বলিবে না কিংবা তাহাদিগকে ধমক দিবে না, কিন্তু তাহাদিগকে সম্মানজনক বাক্য বলিবে।

এবং তুমি তাহাদের জন্য বিনয়ের বাহু সদয়ভাবে অবনত করিবে এবং বলিবে, হে আমার প্রতিপালক প্রভু, তুমি তাঁহাদের প্রতি দয়া কর যেমন তাঁহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছেন।

"তোমাদের প্রতিপালক প্রভু খুব জ্ঞাত আছেন, যাহা তোমাদের মনে আছে। যদি তোমরা ধার্মিক হও, নিশ্চয় তিনি (তাঁহার প্রতি) উন্মুখীনদিগের জন্য ক্ষমাশীল।

"এবং নিকট আত্মীয়কে তাহার হক দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও পথিককেও দাও। কিন্তু অপব্যয় সহকারে অপব্যয় করিও না। নিশ্চয় অপব্যয়িগণ শয়তানের ভাই আর শয়তান হইতেছে তাহার প্রতিপালক প্রভুর প্রতি সদা অকৃতজ্ঞ। এবং যদি তুমি যে দয়া তোমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট আশা কর, তাহার সন্ধানে তাহাদের হইতে মুখ ফিরাও, তবে তাহাদিগকে ভদ্র বাক্য বলিবে। এবং তোমার হাতকে তোমার গলার দিকে শিকলে বাঁধিয়া রাখিও না কিংবা তাহা সম্পূর্ণ ভাবে লম্বা করিও না। তাহা হইলে তুমি নিন্দিত ও সর্বস্বান্তভাবে বসিয়া পড়িবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রভু যাঁহাকে চান, তাহার রুজি বাড়াইয়া দেন কিংবা খাট করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁহার বান্দাগণের সম্বন্ধে খবর রাখেন এবং নজর রাখেন।

"এবং তোমাদের সন্তানদিগকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করিও না। আমি তাহাদের রুজি দেই এবং তোমাদিগকেও। নিশ্চয় তাহাদের হত্যা গুরুতর অপরাধ।

"এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকট যাইও না। নিশ্চয় তাহা নির্লজ্জতা এবং মন্দ পন্থা।

"এবং তোমরা ন্যায় কারণ ব্যতীত সেই প্রাণকে হত্যা করিও না, যাহা আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অত্যাচারিত ভাবে হত হয়, তাকে নিশ্চয় আমি তাহার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দিয়াছি। অনন্তর যেন হত্যায় বাড়াবাড়ি না কর। নিশ্চয় সে সাহায্য পাইবে।

"এবং তোমরা অত্যুত্তমভাবে ভিন্ন অনাথের ধনের নিকট যাইবে না, যে পর্য্যন্ত না সে সাবালক হয়, এবং অঙ্গীকার পালন কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।

"এবং যখন তোমরা মাপ, মাপ পূরা করিবে এবং ঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিবে। ইহা উত্তম এবং পরিণাম হিসাবে অতি সুন্দর।

"এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, তাহার পিছে পড়িও না। নিশ্চয় শ্রবণ, দর্শন এবং হৃদয় — ইহাদের সকলের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইতে হইবে।

"এবং তুমি পৃথিবীতে দেমাগের সঙ্গে চলাফেরা করিও না। নিশ্চয় তুমি মাটি ফাটাইতে পারিবে না কিংবা উঁচুতে পাহাড়ের সমান হইতে পারিবে না।

"এই সমস্ত তোমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট ঘৃণিত মন্দ কাজ। ইহা যে জ্ঞান তোমার প্রতিপালক প্রভু তোমার প্রতি (হে মুহম্মদ,) অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত। এবং আল্লাহের সহিত অন্যকে অংশী করিও না। তাহা হইলে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হইয়া জাহান্নামে পতিত হইবে।" (বনী ইস্রাঈল, ২৩—৩৯)।

মু'মিনের (ধর্মবিশ্বাসীর) ফরয বা অবশ্য কর্তব্য কার্যগুলি কুরআনের আদ্যন্ত বহু স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি সম্বন্ধে ইসলাম জগতের কোনও সম্প্রদায়ের মতভেদ

নাই। ইসলাম মতে তাহাদের ত্যাগ মহাপাপ এবং অস্বীকার কুফর বা ইসলাম বিরোধিতা। আমি এখানে রসুলুল্লাহের (দঃ) অকাট্য হদীস যাহা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

بُنِىَ الاسلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِ الْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"ইসলাম পাঁচটির উপর নির্মিত — আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই এবং মুহম্মদ তাঁহার দাস ও তাঁহার প্রেরিত দূত এই সাক্ষ্য দেওয়া, নমায কায়েম করা, যাকাত দান করা, হজ্জ এবং রমযানের রোযা।"

নৈতিক অপরাধগুলির কয়েকটি কবীরাঃ বা মহাপাপ। কুরআনে উক্ত হইয়াছে ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا

"যদি তোমরা মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত থাক, যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে, তবে আমি তোমাদের হইতে তোমাদের মন্দ দূর করিব এবং তোমাদিগকে সম্মানিত স্থানে দাখিল করিব।" (নিসাঅ, ৩১)।

কুরআন ও হদীসে যেগুলিকে মহাপাপ বলা হইয়াছে, অধিকাংশ শাস্ত্রবিদ্‌গণ তাহাদের সংখ্যা ১৭টি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে সেগুলি উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। কুফর বা ধর্মদ্রোহিতা।
২। বারংবার সগীরাঃ গুণাহ বা ক্ষুদ্র পাপ করা।
৩। আল্লাহের দয়ায় নিরাশ হওয়া।
৪। আল্লাহের গযব বা ক্রোধ হইতে নির্ভয় হওয়া।
৫। মিথ্যা সাক্ষ্য।
৬। কোনও নির্দোষ মুসলমান পুরুষ বা স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।
৭। মিথ্যা হলফ করা।
৮। যাদু করা।
৯। মদ্য পান।
১০। অনাথের সম্পত্তি অন্যায় দখল।
১১। সুদ।
১২। ব্যভিচার।
১৩। অস্বাভাবিক অভিগমন (লওয়াতৎ)
১৪। চুরি।
১৫। হত্যা।
১৬। জিহাদে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন।

১৭। মাতাপিতার অবাধ্যতাচারণ।

কোন কোনও মতে নিম্নলিখিত কার্যগুলিকেও মহাপাপ বলা হইয়াছে।

১৮। নমায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ফরয ধর্মকর্মগুলির মধ্যে কোনও একটি ত্যাগ।

১৯। নমায কাযা করা।

২০। আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও সিজদা করা।

২১। স্ত্রীলোককে উত্তরাধিকার স্বত্ব না দেওয়া।

২২। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

২৩। মিথ্যা কথা বলা।

২৪। আমানাত খিয়ানত করা।

২৫। জুয়া খেলা।

২৬। মুসলমানকে কাফির বলা বা অভিসম্পাত করা।

২৭। আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে কসম করা।

২৮। অন্যের উপর অত্যাচার করা।

২৯। পরোক্ষে কাহারও নিন্দা করা।

৩০। কুরআন শরীফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া।

৩১। কাহারও নিন্দা শোনা।

৩২। খাদ্যদ্রব্য বহুমূল্য হইলে খুশী হওয়া।

৩৩। গয়র মুহরিম স্ত্রীলোকের সহিত নির্জনে বসা।

৩৪। সাধ্যপক্ষে অন্যকে সদুপদেশ না দেওয়া।

৩৫। কাহাকেও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া হীন বা লজ্জিত করা।

৩৬। কাফেরদের রীতিনীতি পছন্দ করা।

৩৭। ওজনে কম করা।

৩৮। নৃত্য দেখা।

৩৯। গান বাজনা শোনা।

৪০। আত্মহত্যা।

কেহ কেহ কবীরাঃ গুনার সংখ্যা ৭০ বলিয়াছেন, কেহ তাহারও অধিক বর্ণনা করিয়াছেন। মোট কথা কুরআন ও হদীসে যে সকল পাপ কার্যের বর্ণনা আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গুরুত্ব অনুযায়ী কতকগুলিকে মহাপাপ বলা হইয়াছে। পূর্বে কুরআন শরীফ হইতে পাপ পুণ্যের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে সময়োপযোগী কুরআন ও হদীসের কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ - وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ - ٥

"হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, নিশ্চয়ই নেশার দ্রব্য, জুয়া, পূজার বেদী এবং মূর্তি শয়তানের কার্যের মধ্যে নোংরা। অতএব তোমরা তাহা হইতে বাঁচ, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তোমরা সফলকাম হইবে। শয়তান ইহাই ইচ্ছা করে যে নেশা ও জুয়ায় তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংঘটিত হউক এবং তোমাদিগকে আল্লাহের স্মরণ ও নমায হইতে আটক রাখুক। অনন্তর তোমরা কি নিবৃত্ত হইবে না?"

(আমি:) (মাইদাঃ, ৯০-৯১)

"মা'আয বর্ণনা করেন— রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে দশটি বিষয়ে চূড়ান্ত উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— আল্লাহেব সহিত কাহাকেও অংশী করিও না, যদিও তুমি নিহত হও বা দগ্ধ হও। মা বাপের অবাধ্য হইও না, যদিও তাঁহারা তোমাকে আদেশ দেন যে তোমার পরিবার বা মাল হইতে পৃথক হইয়া যাও। স্বেচ্ছায় ফরয নমায ছাড়িও না, কারণ যে স্বেচ্ছায় ফরয নমায ছাড়ে, তাহা হইতে আল্লাহের আশ্রয় উঠিয়া যায়। নেশা পান করিও না, কারণ তাহা সমস্ত বেহায়া কাজের জড়। সাবধান! আল্লাহের অবাধ্যতাচরণ করিও না, কারণ, অবাধ্যতায় আল্লাহের ক্রোধ অবস্থান করে। সাবধান! যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইও না, যদিও লোক নষ্ট হইতে থাকে এবং লোক মৃত্যুগ্রস্ত হইতে থাকে এবং তুমি তাহাদের মধ্যে থাক, তবে অটল থাকিও। তোমার যথাসাধ্য পরিবারের জন্য খরচ করিবে, তাহাদের হইতে আদবের ছড়ি উঠাইয়া রাখিবে না এবং তাহাদের মনে আল্লাহের ভয় জন্মাইবে।" (আহমদ)

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ زَادَ مُسْلِمٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ
ثُمَّ اتَّفَقَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا
اؤْتُمِنَ خَانَ

"ভণ্ডের লক্ষণ তিনটি (মুসলিমের হদীসে অতিরিক্ত — যদিও সে রোযা রাখে ও নমায পড়ে মনে করে সে মুসলমান) — যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; যখন ওয়াদা করে, খেলাফ করে; যখন আমানত রাখে, খিয়ানত করে।"

(বুখারী ও মুস্লিম)

"ওয়াবিসাঃ বিন্ মা'বদ হইতে বর্ণিত—নিশ্চয় রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হে ওয়াবিসাঃ, তুমি কি পুণ্য ও পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আসিযাছ? আমি বলিলাম, জী হা। তাহার পর তিনি আঙুল গুটাইয়া নিজের বুকে আঘাত করিয়া তিনবার বলিলেন, তোমার মন হইতে ফতোয়া চাও। তোমার কল্‌ব (হৃদয়) হইতে ফতোয়া চাও। তাহা পুণ্য, যাহাতে তোমার মন শান্তি পায় এবং যাহাতে তোমার কল্‌ব শান্তি পায়। আর তাহা পাপ, যাহা তোমার মনে সন্দেহ উপস্থিত করে আর তোমার বুকে চাঞ্চল্য হয়, যদিও লোকে অন্য ফতোয়া দেয়।" (আহমদ ও দারমী)

যাহা দেশের আইনবিরুদ্ধ, তাহা অপরাধ (crime)। যদি তাহা ইস্‌লাম বিরোধী না হয়, তবে তাহা পালন করা কর্তব্য। হয্‌রত ইয়ূসুফ (আঃ) তাঁহার ছোট ভাইকে চুরি করিয়াছে এই অজুহাতে তাঁহাকে আটক রাখিয়াছিলেন; নতুবা মিসরের আইনে তাঁহাকে আটকাইবার উপায় ছিল না। এস্থলে কুরআন বলিতেছেন ঃ

مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ط

"আল্লাহ যাহা চান তদ্‌ব্যতীত তাহার উপায় ছিল না যে রাজার আইনে তাহার ভাইকে ধরিয়া রাখে।" (ইয়ূসুফ, ৭৬)

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আল্লাহের আদেশ নিষেধগুলি কি খামখেয়ালী। কুরআন তাহার উত্তর দিতেছেন ঃ قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ

"বল, আমার প্রতিপালক প্রভু ন্যায়ভাবে আদেশ করেন।" (আ'রাফ, ২৯)

তবে ইহাও হইতে পারে যে আমাদের আনুগত্য পরীক্ষার জন্য কোনও কোনও আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যদিও তাহাদের মধ্যে কোনও নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই। ইহার দৃষ্টান্ত — তালুত তাহার সৈন্যগণের আনুগত্য পরীক্ষার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন যে, অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও তাহাবা এক আঁজলাব বেশী নদীর পানি খাইতে পারিবে না।

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ج وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ

"যে তাহা হইতে পান কবিবে, সে আমার দলে নয়। কিন্তু যে হাতের এক আঁজলার পরিমাণ ব্যতীত আস্বাদন করিবে না, সেই আমার দলের।"

(বাকারাঃ, ২৪৯)

কুরআন আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন ঃ

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ٥

"এবং সম্ভব তোমরা কোনও কিছু, নাপছন্দ কর, আর তাহা তোমাদের জন্য ভাল; এবং সম্ভব তোমরা কোনও কিছু ভালবাস, তাহা তোমার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।" (বকরাঃ, ২১৬)

আল্লাহের বিধিনিষেধগুলি বিজ্ঞ সুহৃদ চিকিৎসকের ন্যায়। তাহা পালন আমাদের জীবনের জন্য এবং তাহা ত্যাগ আমাদের ধ্বংসের জন্য।

ইস্‌লামিক একাডেমী, ঢাকা, ১২-৯-৬২ তারিখের সেমিনারে প্রথম পঠিত

আমাদের শিক্ষা-সংস্কার

পাক-ভারতে অতি প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখনও সেই সাবেক শিক্ষা মুসলমানের মাদ্রাসায় ও হিন্দুর টোলে বিরাজমান। আধুনিক শিক্ষা-প্রাণালী ব্রিটিশের দান। তাঁরা জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তুলবার জন্যই যে নিঃস্বার্থভাবে এই দেশে আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করেন, তা বলা চলে না। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের বেনে বুদ্ধির কারণে এ দেশে সস্তা রাজকর্মচারী চেয়েছিলেন। বিলেত থেকে ছোট বড় সকল সরকারী চাকুরে আমদানী করতে গেলে, তাঁরা দেউলিয়া হয়ে যেতেন। আরেকটি কারণ ছিল, সেটি ধর্মীয়। তাঁরা চেয়েছিলেন এদেশবাসীকে ক্রমশঃ খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে। কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি খ্রীষ্টান মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারের এই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। এই দুই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে পাক-ভারতে ব্রিটিশ সরকার আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। এতে তাঁরা অনেকটা কৃতকার্যও হয়েছিলেন। যারা স্কুল কলেজে পড়তো, তাদের লেখাপড়া শেখার মুখ্য উদ্দেশ্য হতো চাকুরী। বাঙ্গালীর কাছে ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে চাকুরী ছিল বড় কাম্য। তাই প্রবাদ বাক্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল— "যেমন তেমন চাকুরী, ঘি-ভাত"। তখনকার শিক্ষিত সমাজের কাছে কৃষিকার্য অবজ্ঞার বিষয় হ'য়ে পড়েছিল। 'চাষা' কথাটা একরকম গালিতে পরিণত হয়েছিল। তারা প্রাচীন বিজ্ঞোক্তি ভুলে গিয়েছিল —

> বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, তদর্ধং কৃষিকর্মণি।
> তদর্ধং রাজসেবায়াং, ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ॥

> অর্থাৎ বাণিজ্যে সৌভাগ্য বাস করে, তার অর্ধেক কৃষিকার্যে।
> তার অর্ধেক রাজসেবায়, ভিক্ষায় কিছু নেই কিছু নেই।

স্কুল কলেজের ছাত্ররা ধর্ম-জ্ঞানের অভাবে মদ্যপায়ী ও উচ্ছৃংখল হয়ে উঠত। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' প্রভৃতি বই পড়লে তখনকার ছাত্র-সমাজের দুর্গতি ও দুর্নীতির একটা জঘন্য চিত্র আমাদের চোখে পড়ে। শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের মধ্যে সাহেবিয়ানার প্রভাব এত বেশী পড়েছিল যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, রেভারেন্ড লালবিহারী দে প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যেরা ধর্ম ত্যাগ না করলেও খ্রীষ্টানী ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়েছিল। মুসলমান সমাজে হিন্দু সমাজের ন্যায় ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ব্যাপকভাবে ছিল না।

তার একটি প্রমাণ এই যে, চব্বিশ পরগণার বশিরহাট মহকুমা নানা বিষয়ে অগ্রগণ্য হলেও বর্তমান লেখক তার দ্বিতীয় গ্র্যাজুয়েট ও প্রথম এম. এ.। তার উপর মুসলমান সমাজ অনেকটা রক্ষণশীল। এই জন্য শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মধ্যে ধর্মত্যাগের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্য দিকে তারা ইংরেজী শিক্ষায় বিমুখ হয়ে প'ড়েছিল। যে জাতির হাতে এককালে রাজ-শক্তি ছিল, তারা পরাধীন হ'য়েও পরাধীনতার জোয়াল সহজে ঘাড়ে নিতে পারে নি। তারপর যারা নিজেদের রাজভাষা ফারসীর ঝাণ্ডাবাহী ছিল, তারা বিদেশী ভাষা ইংরেজীর নিকট সহজে মাথা নত করতে পারে নি। তার উপর তারা চোখের সামনে হিন্দু সমাজে ইংরেজী শিক্ষার কুফল দেখতে পাচ্ছিল। ফলে আধুনিক শিক্ষায় মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে যায়। জাতীয় গৌরব এবং ধর্মের গৌরবের জন্যই মুসলমানের এই দুর্গতি হয়। এই জন্য আমি মুসলমানকে নিন্দা না ক'রে বরং প্রসংশাই করি।

মুসলমানের এই সংকট-অবস্থা থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে শামসুল 'উলামা আবু নসর ওহীদ আধুনিক শিক্ষা ও পুরাতন মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যবর্তী 'নিউস্কীম' মাদ্রাসা শিক্ষা প্রণালীর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নওয়াব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় সরকারী শিক্ষা বিভাগ ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এতে মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরাগ অনেকটা চলে যায়। তারপর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখন মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'তে থাকে। এতৎসত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষা প্রণালী ছাত্রদের ধর্ম ও চরিত্র গঠনে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বলা চলে না। ব্রিটিশ আমলের রং এই পাকিস্তানী যুগেও পুরাপুরি বজায় রয়েছে। তাই আল্লামা ইকবাল বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ

শোর হায় হো গয়ে দুনয়াসে মুসলমান না বুদ্,
হম য়িহ্ কহতে হাঁয় কেহ্ থে ভী কহীঁ মুসলিম মওজুদ?
ওযা'মেঁ তুম হো নাসারা তো তমদ্দুন মেঁ হনূদ,
য়িহ্ মুসলমান হাঁয় জিন্‌হেঁ দেখ্‌কে শর্‌মাএঁ য়িহুদ।
য়ুঁউ তো সৈয়িদ ভী হো, মির্যা ভী হো আফগান ভী হো,
তুম্ সভী কুছ্ হো, বতাও তো মুসলমানভী হো?

অর্থাৎ —

উঠছে আওয়াজ দুনিয়া মাঝে ধ্বংস হ'ল মুসলমান,
বলব আমি, সত্যি কোথা মুসলিম ছিল বিদ্যমান!
হিন্দু তুমি তমদ্দুনে, বেশভূষাতে খ্রীষ্টিয়ান,
মুসলমান এই, যারে দেখে য়িহুদ করে লজ্জাজ্ঞান।
সৈয়দও বা মির্যা কিংবা হ'তে পার বা আফগানও,
সবই তুমি হ'তে পার, বল তুমি মুসলমানও?

Stanly Hall ধর্ম-শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেছেন —If you teach your children the three Rs (of reading, writing and Arithmetic) and leave the fourth R (of religion) you will get a fifth R (of rescality)— অর্থাৎ যদি তুমি তোমার ছেলেকে তিনটি R অর্থাৎ reading (পড়া), writing (লেখা) এবং Arithmetic (অঙ্ক) শেখাও আর চতুর্থ R (religion ধর্ম)-কে বাদ দাও, তবে তুমি পাবে পঞ্চম R (rascality অর্থাৎ বদমায়েশি)।

জাতীয় শিক্ষা-কমিশন শিক্ষা-প্রণালীতে ধর্মের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেছেন, "মানব জাতির ইতিহাসে ধর্ম হচ্ছে সভ্যতাসৃষ্টিকারিণী সর্বাপেক্ষা তেজস্বিনী শক্তি এবং ধর্মবিশ্বাস মানব-জীবনকে সাধুতা ও ধার্মিকতার পথনির্দেশ করেছে। সর্বশক্তিমানের প্রতি ভক্তি অহমিকা ও বৃথা গর্বকে দমন করে এবং ধীরতা ও বিনয়কে জন্মদান করে। ধর্ম থেকে উদ্ভূত বিস্ময়বোধ অজানার সন্ধানে প্রেরণা দেয় এবং সেটি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূল। ধর্মীয় আদেশ মানব জাতিকে সুগঠিত করেছে আর মানুষকে যৎপরোনাস্তি আত্মত্যাগ ও সাহসের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। ঐশ্বরিক প্রেম মানবপ্রবৃত্তিকে মহীয়ান্ করেছে, সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করেছে। আর তার সৌন্দর্যবোধকে সন্তুষ্ট করবার জন্য শিল্পকলা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ধর্মীয় ঐক্য ব্যক্তিসমূহকে একতাযুক্ত দলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করেছে এবং ভ্রাতৃভাবকে ক্রমশঃ প্রসারিত ক'রে পরিশেষে বিশ্বমানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধে পরিণত করেছে। এরূপে ধর্ম মানুষকে মহত্তম আদর্শবাদে এবং আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এ তাব জীবনের সকল দিক্‌কে বাহুপাশে আবদ্ধ করেছে। এ সেই শক্তি যা সমাজকে এক ঐক্যতানবদ্ধ গোটা সামগ্রীতে গড়ে পিটে নিতে পারে।"*

এই রিপোর্টের উপর যে সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে ধর্ম শিক্ষাকে শিক্ষা প্রণালীর এক অখণ্ড অংশ বলা হয়েছে। ধর্ম শিক্ষাকে তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরে ভাগ করা হয়েছে। (১) বাধ্যতামূলক স্তরে — প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। (২) ইচ্ছাধীন স্তরে— নবম ও দশম শ্রেণীতে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ধর্মশিক্ষা ইসলামী শিক্ষার (Islamic Studies) অন্তর্ভুক্ত হবে, তা ছাত্রেরা ইচ্ছাধীনরূপে নিতে পারবে। (৩) গবেষণামূলক স্তর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীতে ইসলামী শিক্ষা ইচ্ছাধীন থাকবে। কিন্তু সেখানে ছাত্র ও শিক্ষকগণ ইসলাম সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে তাকে আধুনিক জগৎ ও জীবনের উপযোগী ব'লে প্রতিপন্ন করবেন। কুরআন ও হাদীসের পূর্ণ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে। ইসলামী আইনের মূলনীতি, মুসলিম ইতিহাস এবং মুসলিম দর্শন ইসলামী পাঠ্য বিষয়ের এক অখণ্ড অংশ হবে।

প্রথম স্তরে ধর্ম শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হ'লে শিক্ষক ও মাতাপিতাকে আদর্শচরিত্র হ'তে হবে, ব'লে রিপোর্ট যে মন্তব্য করেছেন, তা অতি মূল্যবান্। বলা হয় example is better than precept. বাস্তবিক শত উপদেশ অপেক্ষা এক উদাহরণ অধিকতর কার্যকর। এইরূপে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রও গঠিত হবে। ধর্মশিক্ষাকে কেবল বই-কিতাবে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখলে চলবে না। শিক্ষক ও ছাত্রগণকে সমবেতভাবে নিত্য তার অনুষ্ঠান করতে হবে।

* Report of the Commission on National Education, পৃঃ ২০৯।

ধর্মশিক্ষাকে কেবল পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করলে যথেষ্ট হবে না। তাকে পরীক্ষার বিষয়ও করতে হবে। পূর্বে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল; কিন্তু পরীক্ষণীয় বিষয় না থাকায়, অধিকাংশ স্থলে তা কাযীর গরুর দশা পেয়েছিল। কাযীর গরু খাতাপত্রে থাকত, কিন্তু তা গোয়ালে খুঁজে পাওয়া যেত না।

একটি বড় কথা হচ্ছে যে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনও শিক্ষা দিতে হ'লে, শিক্ষক ও ছাত্রদের শিক্ষা সম্বন্ধে বর্তমান মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এই কথা তাদের মনে গেঁথে দিতে হবে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ করা, চাকরী বা শুধু জ্ঞান অর্জন নয়। জ্ঞান খুবই বড় জিনিস। যে জাতি যত জ্ঞানে উন্নত, তাদের সম্মান ও ঐশ্বর্যও তত উন্নত। বর্তমান জগতে কোনও জাতিকে টিকে থাকতে হ'লে তাকে জ্ঞান চর্চা ক'রতেই হবে। কিন্তু যে জ্ঞান মানুষকে মানুষ করে না, কেবল লাঙ্গুল-শৃঙ্গবিহীন পশু করে, সে জ্ঞান তুচ্ছ, সে জ্ঞান শয়তানী জ্ঞান।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ ক'রতে হ'লে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তাকে ভালবাসা এবং তাঁর ভালবাসার খাতিরে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে ভালবাসা ও সেবা করা — এই হ'ল ধর্মের প্রাণ। আমাদের রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন —

"আল্‌খল্‌কু 'আয়ালুল্লাহি, ফআহাব্বুল্ খল্‌কি ইলাল্লাহি মন্ আহ্‌সনু ইলা ' আয়ালিহি" — অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহের পরিজন; সেই আল্লাহের অধিকতর প্রিয়, যে তার পরিজনের অধিক হিতকারী।

তিনি আরও বলেছেন — "খয়রুন্ নাসি ময়্যনফ'উন্ নাস" অর্থাৎ সেই লোক সকলের চেয়ে ভাল, যে লোকের সকলের চেয়ে বেশী উপকার করে।

নমায, রোযা, হজ্জ প্রত্যেকেরই মধ্যে যেমন আল্লাহের স্মরণ ও উপাসনা আছে, সেইরূপ নৈতিকতা শিক্ষারও তাগিদ আছে। নৈতিকতাবিহীন ধর্মানুষ্ঠান কেবল ভণ্ডামি। রসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন —

"ভণ্ডের লক্ষণ তিনটি — (১) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; (২) যখন অঙ্গীকার করে, ভঙ্গ করে; (৩) যখন তার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে।" (বুখারী ও মুসলিম), অধিকন্তু মুসলিম শরীফে আছে "যদিও সে রোযা করে, নমায পড়ে এবং ধারণা করে যে, নিশ্চয় সে মুসলমান।"

রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে প্রচারিত।

ইস্‌লাম ঃ মানবতার মুক্তিদূত

আজ থেকে সাড়ে তেরশ' বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ ছিল নানা বাঁধনে বাঁধা জীব। জনসাধারণ ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীন প্রজা। রাজাই ছিলেন তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। রাজা ছিলেন আইন-কানুনের উর্ধ্বে। রাজা ছাড়াও আরও অনেক ক্ষুদে কর্ত্তারা ছিলেন। মনিব ছিল ক্রীতদাসদের জানের মালের মালিক। মহাজনেরা ছিল খাতকদের প্রচণ্ড প্রভু। পুরোহিতেরা ছিলেন খোদা আর তাঁর বান্দাদের মধ্যবর্তী উকিল। খোদার কাছে আবেদন নিবেদন করতে গেলে এই উকিল ছাড়া গতি ছিল না। স্বামী ছিল স্ত্রীর সর্বময় প্রভু। স্ত্রী ছিল স্বামীর ক্রীতদাসী। মানবতা যখন এইরূপ নানা শৃংখলে বদ্ধ হ'য়ে মুক্তির জন্য ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছিল, তখন পরমকরুণাময় খোদাতা'আলা তাদের মুক্তিদাতা স্বরূপে পাঠালেন হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে।

আল্লাহ্‌তা'আলার বাণী বিশ্বভুবনে বিঘোষিত হ'ল ঃ

"যারা সেই নিরক্ষর রসূল নবীর অনুসরণ করে, যার বিষয়ে তারা তৌরাতে (য়িহুদীদের ধর্মশাস্ত্রে) এবং ইন্‌জীলে (খ্রীষ্টানদের ধর্মশাস্ত্রে) লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎকার্যে আদেশ করে, ঘৃণিত কার্যে নিষেধ করে, তাদের জন্যে পবিত্র বস্তুকে হালাল (বৈধ) করে, অপবিত্র বস্তুকে হারাম (অবৈধ) করে, আর তাদের (পায়ে) যে বেড়ি এবং (গলায়) যে শিকলি আছে, তা' খুলে দেয়। অনন্তর যারা তাকে বিশ্বাস করে, সম্মান করে ও সাহায্য করে, আর তার সঙ্গে যে নূর (জ্যোতি) অবতীর্ণ হয়েছে, তার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম। (হে মুহম্মদ!) তুমি ব'লে দাও, 'হে মনুষ্যজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট সেই আল্লাহের রসূল (দূত), স্বর্গমর্ত্যের রাজত্ব যাঁর, যিনি ছাড়া আর কোনও দেবতা (ইলাহ্‌) নেই, যিনি বাঁচান ও যিনি মারেন।" সূরাঃ আ'রাফ, আয়াত ১৫৭, ১৫৮)।

ইসলাম কিরূপে মানবতার বেড়ি ও শিকলি কেটে দিয়ে তাকে মুক্তি দিয়েছিল, তা' এখন বলছি।

মনু বলেছিলেন— অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্মিতোনৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্বভূতানি তেজসা।

অর্থাৎ ইন্দ্র, বরুণ, যম ইত্যাদি আটটি দেবতার অংশ দিয়ে রাজা গড়া। সেজন্যে তিনি সকল প্রাণীকে নিজের তেজে অভিভূত করেন।

নিয়মতান্ত্রিক ইংলণ্ডের আইনে এখনও বলে —

The king can do no wrong.

কিন্তু ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে, "খাদিমুল কওমি রঈসুহুম" —

অর্থাৎ জাতির সেবক হবেন জাতির নেতা। প্রজারা যাঁকে নির্বাচিত করবে, তিনি হবেন আমীরুল মুমিনীন — মুসলমানদের আজ্ঞাদাতা বা নেতা। বংশানুক্রমিক রাজা প্রথা ইসলাম-বিরোধী। রাজা, মহারাজ শব্দগুলি ইসলামে ঘৃণিত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন—

"শেষ বিচার (কেয়ামতের) দিনে আল্লাহ্‌তা'আলার নিকট মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে ক্রোধগ্রস্ত আর মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে ঘৃণিত সেই ব্যক্তি, যাকে বলা হ'ত রাজাধিরাজ। আল্লাহ্ ছাড়া কোনও রাজা নেই।" (হদীস মুসলিম)।

কুরআনেরও শিক্ষা যে, আল্লাহ্ একমাত্র রাজা (মালিক) এবং রাজ্যাধিকারী, তিনি যাকে চান রাজ্য দান করেন। রাষ্ট্রপতি আল্লাহের প্রতিনিধি (খলীফাঃ) মাত্র।

"বল, হে আল্লাহ্! হে রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজ্য দান কর, আর যাকে চাও তার থেকে রাজ্য কেড়ে নেও; তুমি যাকে চাও সম্মানী কর, আর যাকে চাও হীন কর। তোমারই হাতে মঙ্গল, নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে শক্তিশালী।"

(সূরাঃ আল'ইমরান, আয়ত ২৬)

এই সর্বশক্তিমানের কার্য স্বেচ্ছাচারিতা নয়। তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।

হযরত দাউদকে (আঃ) আল্লাহ্‌তা'আলা উপদেশ দিয়েছিলেন —

"হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলীফাঃ) করেছি। অতএব হকভাবে লোকের মধ্যে বিচার কর, প্রবৃত্তির অনুসরণ ক'রো না, সেটা তোমাকে আল্লাহের পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে আছে কঠিন শাস্তি। কেন না তারা হিসাবের দিনকে ভুলেছিল।" (সূরাঃ সদ, আয়ত ২৬)

হয্‌রত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এবং খলীফাঃ চতুষ্টয়ের (রাঃ) জীবনী দেখুন। তাঁরা রাজ্যপতি ছিলেন, কিন্তু রাজা ছিলেন না। সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রা থেকে তাঁদের জীবন-যাত্রার কোনও তফাৎ ছিল না।

এখন প্রভু-ভৃত্যের কথা। হয্‌রত মুসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি মহান ধর্মপ্রবর্তকদের কেউ-ই দাসত্ব প্রথাকে রহিত করেন নি। এ ছিল প্রাচীন জগতের একটা অর্থনৈতিক সামাজিক বিধান। ইস্‌লাম এই প্রথাকে এমন চতুরতার সঙ্গে রহিত করেছে যে, পুরাতন প্রথার লোপ লোকে সহজে বুঝতেই পারেনি। প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নির্দেশ দিলেন যে, মানুষ মানুষের ভাই ঃ "আল্ ইন্‌সানু আখুল্ ইন্‌সান্।" কেউ যেন কোনও পুরুষকে দাস এবং কোনও মেয়েকে দাসী না বলে। খাওয়া-পরায়, পোষাকে-পরিচ্ছদে মনিব চাকরের কোন ভেদ থাকবে না। চাকর যখন মনিবকে ছেড়ে যেতে চাইবে, তার জন্যে সেটা ভাল হবে জানলে, তাকে ছেড়ে দিতে হবে। যদি কিছু মুক্তি মূল্য দিতে হয়, তবে অন্যে

তাকে সাহায্য করবে, কিংবা সরকারী তহবিল থেকে তাকে সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন— "তোমাদের ভৃত্যদের মধ্যে যারা মুক্তিপত্র চায়, তাদেরকে মুক্তিপত্র লিখে দাও, যদি তোমরা তা তাদের মধ্যে ভাল জান, এবং আল্লাহের মাল থেকে যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, তাদেরকে দাও।" (সূরাঃ নূর, আয়ত ৩৩)

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আল্লাহের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, "আমি (আল্লাহ্) শেষ বিচার (কেয়ামতের) দিনে তিন ব্যক্তির শত্রু হব, — যে আমার নাম নিয়ে অঙ্গীকার ক'রে ভঙ্গ করে, যে স্বাধীন লোককে বিক্রি ক'রে তার মূল্য খায়, আর যে মজুরকে কাজে লাগিয়ে কাজ পুরো ক'রে তার মজুরি দেয় না।" (হদীস বুখারী)

মহাজন ও খাতকের মধ্যে ইসলামের বিধান এই যে, মহাজন সুদ নিতে পারবে না। খাতককে তার সুবিধার জন্য সময় দিবে কিংবা অসমর্থ হ'লে তাকে মাফ ক'রে দেবে। খাতককে জেলে দেবার বিধান কুরআনে নাই। কুরআন বলে —

"যদি সে (খাতক) কষ্টে পড়ে, তবে তার সুসার হওয়া পর্যন্ত তাকে অবসর দেওয়া চাই, আর যদি তোমরা দান ক'রে দাও, তবে তা' তোমাদের জন্য ভাল, যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে।" (সূরা বকরঃ আয়ত ২৮০)

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, "যেদিন আল্লাহের 'আর্শের (সিংহাসনের) ছায়া ভিন্ন কোনও ছায়া থাকবে না, সেদিন তিনি তাকে তাঁর সিংহাসনের ছায়ায় স্থান দিবেন, যে তার অভাবগ্রস্ত খাতককে সময় দেয় কিংবা তাকে একেবারে রেহাই দেয়।" (হদীস মুস্‌লিম)

ইসলাম পৌরোহিত্যকে একেবারে লোপ ক'রে দিয়েছে। বান্দা খোদাকে ডাকলে খোদা তার জওয়াব দিবেন। আল্লাহ্‌তা'আলা বলেন—

"এবং তোমাদের প্রভু বলেন যে আমাকে ডাক। আমি জওয়াব দিব।" (সূরাঃ মুমিন, আয়ত ৬০)

পুনশ্চ —

"যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন (ব'লো) যে, নিশ্চয় আমি কাছে আছি। আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাকের জওয়াব দিই। (সূরা বকরঃ, আয়ত ১৮৬)

বাস্তবিক য়িহুদী, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি সকল প্রাচীন ধর্মেই পৌরোহিত্যবাদ আছে। একমাত্র ইস্‌লামই এর থেকে মুক্ত।

নারীজাতি সম্বন্ধে কোনও পুরাতন ধর্মমতে কোনও মঙ্গলজনক ব্যবস্থা দেখা যায় না। নারী ছিল দায়ভাগরহিত। বহুবিবাহ কোনও প্রাচীন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল না। একমাত্র ইস্‌লাম নারীকে তার উপযুক্ত স্বত্ব দিয়েছে। আল্লাহ বলেন —

"তাদের উপর পুরুষের যে অধিকার আছে, তাদেরও পুরুষের উপর সেইরূপ ন্যায্যমত অধিকার আছে।" (সূরা বকরঃ, আয়ত ২২৮)

ইস্‌লাম যুদ্ধ ইত্যাদি অন্তে নারীব সংখ্যাধিক্য বশতঃ প্রয়োজন বিবেচনা ক'রে বহুবিবাহকে চারি বিবাহে সীমাবদ্ধ করেছে, কিন্তু সেখানেও বিধান আছে যে, "যদি,

তোমরা ভয় কর যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তবে (স্বাধীনা) নারীকে কিংবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী হয়েছে, তাকে বিবাহ কর।"

(সূরাঃ নিসা-অ, আয়ত ৩)

"তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী হয়েছে"— আমি এর দ্বারা যুদ্ধের বন্দিনী মুসলমান নারীগণকে বুঝি, যদি তাদের আত্মীয় তাদের মুক্তিমূল্য দিয়ে উদ্ধার না করে কিংবা তাদেরকে অমনি মুক্ত না করা হয়।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই পুরুষ ভাল, যে তার পরিজনদের কাছে ভাল।" আমাদের মনে রাখতে হবে, এখন ইস্‌লামের ১৩৮২ সাল। খ্রীষ্টান জগৎ ১৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে যা করেছিল, ইস্‌লাম তার চেয়ে অনেক বেশী করেছে। তবে এখনও ইস্‌লামের কর্তব্য শেষ হয়নি।

রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে ১৭-১২-৬১ তারিখে প্রচারিত ও মাহে নও, ১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৬৮॥

জগতের আদর্শ মহামানব

মানুষের প্রাণ ধারণের জন্য চাই বায়ু। দানাপানির অভাবে না হয় মানুষ কয়েকদিন বাঁচতে পারে, কিন্তু বাতাসের অভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে মানুষের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। তেমনই মানুষের আত্মার জন্য চাই ধর্ম; তাই মানুষ যত পুরানো, ধর্ম তত পুরানো। ধর্ম সত্য ও সনাতন। যদি স্বীকার করি বিশ্বজগতের এক সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ প্রভু "রব্বুল 'আলামীন" আছেন, তবে স্বীকার ক'রতে হয় যে তিনি মানুষকে জানিয়ে দিতে সক্ষম কোন্ কাজ তাঁর প্রিয়, কোন্ কাজ তাঁর অপ্রিয়। রাজা ব্রডকাষ্ট করছেন, বৈদ্যুতিক শক্তি সেই ভাষণ ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে, যার রেডিও আছে সেই সে বাণী শুনতে পাচ্ছে; কিন্তু কেবল শুনলে হবে না, রাজার ভাষা বোঝা চাই। যার রেডিও আছে এবং যে রাজভাষা বোঝে, সেই বলতে পারে, "শোন মানুষ ভাই, আমি রাজার এই বাণী শুনেছি।" এমনই ক'রে বিশ্বের রাজা তাঁর বাণী তাঁর বিশেষ শক্তির মাধ্যমে তাঁর বিশেষ বিশেষ দাসের অন্তরে নিক্ষেপ করেছেন মানুষের আদিযুগ থেকে। আল্লাহের এই দাস হচ্ছেন নবী বা ধর্মপ্রবর্তক, আল্লাহের বাণীই কালামুল্লাহ বা ধর্মশাস্ত্র, আল্লাহের প্রেরিত সেই বিশেষ শক্তি স্বর্গীয় দূত জিব্রীল আর এই অন্তবে নিক্ষেপই "ওহী" বা প্রত্যাদেশ। নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ) প্রভৃতি অসংখ্য নবী দুনিয়ায় হ'য়ে গেছেন। হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁদের মধ্যে একজন এবং শেষ। তিনিও ছিলেন আমাদেরই মত মানুষ; কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি ছিলেন "ওহী" বা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত মানুষ। আল্লাহের আদেশে তিনি ঘোষণা করেছেন "ইন্নামা আনা বশরুম্ মিস্লুকুম য়ূহা ইলাইয়্যা"— অর্থাৎ আমি তোমাদের মত মানুষ ভিন্ন আর কিছু নই, তবে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

জগতের সমস্ত নিরপেক্ষ জীবনী সমালোচক তাঁকে মহামানব ব'লে মেনেছেন। বাস্তবিক, কেউ তাঁকে নবী ব'লে মানুক বা না মানুক, তাঁকে মহামানব ব'লে মানতেই হ'বে। তিনি জগতের ইতিহাসে, কেবল রাজনৈতিক ইতিহাসে নয়, কৃষ্টির ইতিহাসেও, এমন বিপ্লব সৃষ্টি ক'রেছিলেন যে, তাঁকে বাদ দিয়ে কোন ইতিহাসই রচিত হ'তে পারে না। আলেকযাণ্ডার, জুলিয়াস সীযার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন, তা' জলবুদ্‌বুদের মত মিটে গেছে। কার্ল মার্কস্, লেনিন প্রভৃতি যে বিপ্লব সৃষ্টি ক'রেছেন, তা হাজার বছরের পরেও যে থাকবে, সে কথা কে ব'লতে পারে? কিন্তু রসূলুল্লাহের নবসৃষ্টি জগতে আজ ১৩৮২ হিজরী পর্যন্ত তো টিকে আছে। আমাদের অটল বিশ্বাস জগতের শেষ দিন পর্যন্ত তা বজায় থাকবে। আমরা তাঁকে বলতে পারি সব চেয়ে বড় বিপ্লবী ও বড় শিল্পী।

জগতে অনেক মহামানব আবির্ভাব হয়েছেন। তাঁদের কৃতিত্ব এক এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কেউ ধর্মে, কেউ যুদ্ধে, কেউ বাগ্মিতায়, কেউ সাহিত্যে, কেউ রাজনীতিতে মহত্ত্ব লাভ করেছেন; কিন্তু মহত্ত্বের সবক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করেছেন কেবল একজন। তিনি মুহম্মদ রসূলুল্লাহ (দঃ)। এটা আমি ভক্তির উচ্ছ্বাসে বলছি না। একজন ফরাসী লেখক Alfred de Lamartine তাঁর তুর্কীর ইতিহাসেব প্রথম খণ্ডে বলেছেন —

"দার্শনিক, বক্তা, ধর্ম-প্রচারক, যোদ্ধা, আইন-রচয়িতা, ভাবেব বিজয়কর্তা, ধর্ম্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্মপদ্ধতির সংস্থাপক, কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দেখ সেই মুহম্মদকে (দঃ)। মানুষের মহত্ত্বের যতগুলি মাপকাঠি আছে তা দিয়ে মাপলে, কোন লোক তাঁর চেয়ে মহত্তব হ'তে পারে ?"*

আমরা এই জন্য তাঁকে বলি অতিমহামানব "খয়রুল বশর"। কবি অন্যায় বলেন নি —

ইয়া সাহিবল্ জমালি ইয়া সয়্যাদল্ বশর।
মিন্ ওজ্ হিকাল মুনীরি লকদ্ নওওরাল্ কমর।
লা ইয়ুম্‌কিনুস্ সানাউ কমা কানা হক্কুহু।
বা'দ আয খুদা বুযুর্গ তুঈ কিস্‌সাঃ মুখ্‌তসর।

হে মোর সুন্দরতম! হে নব রতন!
চাঁদেরে দিয়েছে জ্যোতি তোমারই আনন।
অসম্ভব যথাযোগ্য প্রশংসা তোমার,
সংক্ষেপে, খোদার নীচে তোমারি আসন।

হযরত মুহম্মদ (দঃ) মানবতার গৌরবের জয়ভেরী বাজিয়েছেন। খোদা মানুষের মুক্তির জন্য পৃথিবীতে এলেন কিংবা তাঁর পুত্রকে সংসারে পাঠিয়ে দিলেন; তার পর এঁরা অলৌকিক বড় বড় কাজ করলেন। এইরূপ বিশ্বাসে মানুষকে বড় করা হয় না, বরং খোদাকে খাটো করা হয়। পক্ষান্তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে হযরত মুহম্মদ (দঃ) আমাদের মতই রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন। তবু তিনি যে এত বড় হ'তে পেরেছিলেন, এটা মানবতার পরম চরিতার্থতা, মানবতার মহাবিজয়

হযরতকে বলতে হয় জগতের আশ্চর্যতম মানুষ —the most wonderful man of the world. সেকালের সভ্য জগৎ থেকে বহুদূরে এক মরুব দেশে এক শিশু ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল, আরবী রবিউল আউয়াল মাসের ৮ই তারিখে, সোমবারের ভোরে জন্মেছিলেন। জন্মাবার পূর্বেই তিনি হয়েছিলেন বাপহাবা এতিম। তাঁর মা তাঁকে ছেড়ে গেলেন যখন তাঁর বয়স ছ'বৎসর। তখন তাঁর বুড়ো দাদা তাঁকে

---

* "Philosophe, orateur, apotre, legislateur, gurerier, conquerant d' idees, restaureteur de dogmes, d' un culte sans images, fondateur de vingt empires terrestres et d' un empire spirituel voila Mahomet A toutes les echelles on l' on measure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ?"

লালন-পালনের ভার নিলেন। তিনিও গেলেন তাঁকে ফেলে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ন' বৎসর। তখন তাঁর ভার পড়ল তাঁর এক চাচার উপর। গরীব চাচা তাঁকে লেখাপড়া শেখাতে পারলেন না। তাঁকে তিনি ছোট বেলায় ভেড়া-ছাগল চরানোর কাজে লাগালেন, আর একটু বড় হ'লে তিনি তাঁকে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগিয়ে দিলেন। এই সচ্চরিত্র বণিক্ ২৫ বৎসর বয়সে ৪০ বৎসর বয়সের তাঁর ধনবতী বিধবা মনিবকে বিবাহ ক'রলেন। এর পর তিনি সংসারী হ'য়েও বিরাগী জীবন যাপন করতে লাগলেন। তখন অনেক সময় তিনি পাহাড়ের গুহায় ব'সে তাঁর পরম প্রভুর ধ্যানধারণায় দিন-কি-দিন রাত-কি-রাত কাটিয়ে দিতে লাগলেন, এই হ'ল তাঁর প্রিয় কাজ। যখন তাঁর বয়স ৪০ বৎসর, তখন তাঁর কাছে দীন্ দুনিয়ার মালিকের কাছ থেকে দূত এসে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আল্লাহের প্রেরিত রসূল ও সংবাদবাহক নবীরূপে নিযুক্ত হয়েছেন। এখন থেকে তাঁর একমাত্র কাজ হ'ল আল্লাহের কথা জগতে প্রচার করা। তিনি ছিলেন অতি প্রিয়দর্শন, মধুর স্বভাব, সর্বজনপ্রিয় মানুষটি। কিন্তু যখন তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ"— আল্লাহ ছাড়া আর অন্য উপাস্য দেবতা নাই, আর মুহম্মদ আল্লাহের প্রেরিত সংবাদবাহক — তাঁর দেশবাসী তার পরম শত্রু হ'যে দাঁড়াল। কত প্রলোভন! কত ধিক্কার! কত যন্ত্রণা তারা তাকে দিল। কিন্তু তিনি তাঁর প্রভুর কাজ হাসিমুখে অবিচলিত ভাবে ক'রতে লাগলেন; তাতে তিলমাত্র শৈথিল্য করলেন না। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করলে। তিনি প্রিয় জন্মভূমি ছাড়লেন; কিন্তু প্রভুর কাজ ছাড়লেন না। ধর্মের জন্য তাঁর পবিত্রদেহের রক্তপাত হ'ল। তাঁর ভক্তরা জান কুরবানী করলেন। পরে ধর্মের জয় হ'ল। ২৩ বৎসরের মধ্যে সমস্ত দেশ তাঁর মত মেনে নিলে। মরণ কালে তিনি বললেন "আল্লাহুম্মা রফীকল 'আলা"—হে আল্লাহ, হে মহান সখা। তারপর তাঁর আত্মা অমরধাম জান্নাতুল ফিরদৌসে মহাপ্রয়াণ করলে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি বাজি'উন। ইনি মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্ (দঃ)।

ইনি যে ধর্মপ্রবর্ত্তক হবেন তাতে বিস্ময়ের কোনও কথা ছিল না। কিন্তু তিনি — এক আজন্ম অনাথ, নিরক্ষর, সহায়সম্পদবিহীন দরিদ্র তিনি — কিরূপে অতিমহামানব হলেন, সেটা কি পরম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? টমাস কারলাইল বিস্মিত হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন —

"এই আরবেরা, মানুষ মুহম্মদ আর সেই একটি শতাব্দী — এ কি এমনটি নয় যেন কোনও স্ফুলিঙ্গ, একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ, পৃথিবীর উপর পড়ল, এমন পৃথিবীর উপর যাকে মনে হয়েছিল সামান্য কালো বালি মাত্র; কিন্তু দেখ তো, সেই বালি হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে একেবারে বারুদ, আকাশ প্রমাণ হ'য়ে জ্ব'লে উঠছে দিল্লী থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত।"

ধর্মপ্রবর্ত্তক অনেক হয়েছেন। কিন্তু কেউ চিরকুমার, কেউ সংসারত্যাগী, কেউ নিরীহ ধর্মগুরু। আমাদের মত অসংখ্য সংসারিক জীব তাঁদিগে ভক্তি-বিমুগ্ধ চক্ষে দেখবে মাত্র। সাধ্য কি তাঁদের কাছে যাওয়া। আমরা তাঁদের মধ্যে আমাদের জীবনপথের আদর্শ সাথী পাই না। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (দঃ) আমাদের সকলেরই

আদর্শ। স্বামী দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে স্ত্রী-অনুরাগী আদর্শ স্বামী। পুত্র দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে পিতৃমাতৃভক্ত আদর্শ পুত্র। পিতা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে মমতাশীল কর্তব্য-পরায়ণ আদর্শ পিতা। গৃহী দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে স্বহস্তে গৃহকর্মরত আদর্শ গৃহী। যোগী দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে সংসার মধ্যে ধ্যাননিরত আদর্শ যোগী। প্রভু দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে সদয়, হাস্যবদন আদর্শ প্রভু। ভৃত্য দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী আদর্শ ভৃত্য। বণিক্ দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে সত্যবাদী আদর্শ বণিক। যোদ্ধা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে নির্ভীক আদর্শ যোদ্ধা। সেনাপতি দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে রণকুশল স্থিরমস্তিষ্ক আদর্শ সেনাপতি। নেতা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে হিতৈষী জনসেবক আদর্শ নেতা। বিচারকর্তা দেখতে পাবে তাঁর মধ্যে নিরপেক্ষ, ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ বিচারক। কুর'আন শরীফে তাই তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে "লকদ্ কানা লাকুম ফী রসূলিল্লাহি উস্‌ওয়াতন্ হাসানা" — নিশ্চয়ই আল্লাহের রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য অতি উত্তম আদর্শ আছে।

তাঁর পূর্বে ও পরে অনেক ধর্মপ্রবর্ত্তকদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ক্ষমতার উপাখ্যান শুনতে পাই। কেউ ভরা দরিয়ার মধ্যে শুকনা পথে পার হ'য়ে গেছেন, কেউ মরাকে বাঁচিয়েছেন, কেউ পাহাড়কে ছাতার মত ঊর্ধ্ব ক'রে ধরেছেন। এই সমস্ত ভক্তেরা বিশ্বাস করে। অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করাবার মত কোনও দলিল নেই, হযরত মুহম্মদ (দঃ) সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক অলৌকিক কার্য্যের বর্ণনা আছে। সেগুলির অনেকটি ঐতিহাসিক প্রমাণের কষ্টি পাথরে সত্য বলে টিকতে পারে। কিন্তু দুটি অলৌকিক কার্য অতি অবিশ্বাসীও বিশ্বাস করতে বাধ্য। একটি আরব জাতির অভ্যুত্থান ও দ্বিতীয়টি মহা-কুর্‌আন। এইখানে আমি দু'জন অমুসলমানের নিরপেক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করব। Thomas Carlyle বলেন —

"আরবজাতির পক্ষে এ ছিল আঁধার থেকে আলোয় জন্ম, আরব এতে পেলে প্রথমে জীবন। এক গরীব রাখালের জাতি পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে তার মরুভূমিতে সকলের অজ্ঞাতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; এক বীর নবীকে উপর থেকে পাঠান হ'ল তাদের কাছে এমন কথার সঙ্গে, যা তারা বিশ্বাস করতে পারে। দেখ তো, অজ্ঞাত হচ্ছে জগদ্-বিখ্যাত, ক্ষুদ্র হচ্ছে জগদ বৃহৎ। তারপর এক শতাব্দীর মধ্যে আরব হচ্ছে এদিকে গ্রানাডায় আর ওদিকে দিল্লীতে — বীর্যে, ঐশ্বর্যে আর প্রতিভার আলোকে আলোকিত হ'য়ে আরব বহু যুগ ধ'রে পৃথিবীর এক বড় অংশের উপর আলো দিচ্ছে।"

একটি মৃত জাতির জীবনদান, এ কি শত সহস্র মৃত ব্যক্তির জীবনদানের চেয়ে অলৌকিক নয়?

কুর্‌আনের শক্তি সম্বন্ধে Emmanuel Duetsch বলেন —

"একটি পুস্তক যার সাহায্যে আরবেরা মহান্ আলেকযাণ্ডার অপেক্ষা, রোম অপেক্ষা, পৃথিবীর বৃহত্তর ভূভাগ জয় করতে সমর্থ হয়েছিল, রোমের যত শতক্ বৎসর লেগেছিল তার জয় সম্পূর্ণ করতে, আরবের লেগেছিল তত দশক। এরই সাহায্যে সমস্ত সেমেটিক জাতির মধ্যে কেবল আরবেরাই এসেছিল ইউরোপে

বাজারূপে, যেখানে ফিনিশীয়রা এসেছিল বণিকরূপে আর যিহুদীরা এসেছিল পলাতক কিংবা বন্দীরূপে। তারা এসেছিল ইউরোপে এই সব পলাতকদেব সঙ্গে মানব জাতির সামনে আলোকে উঁচু ক'রে ধরতে — কেবল তারাই যখন চারদিকে ছিল অন্ধকার, গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তুলতে : দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীতের সোনার শিল্প পূর্ব-পশ্চিমকে শেখাতে, আধুনিক বিজ্ঞানের শৈশব দোলার কাছে দাঁড়াতে; আর যেদিন গ্রানাডার পতন হয়েছিল সেদিনের জন্য এই পরবর্তী যুগের আমাদেরকে চিরকাল কাঁদাতে।"

আমরা উপসংহারের পূর্বে সেই মহানবীর সম্বন্ধে এই আশীর্বাণী (দরূদ) পাঠ করি —

"বালাগুল 'উলী বা কামালিহী।
কশফাদ্ দুজা বা জামালিহী॥
হাসুনত জমী'উ খিসালিহী।
সাল্লু আলায়হি ওআ আলিহী॥'"

করিলেন অত্যুন্নতি তিনি পূর্ণতায়,
নাশিলেন তামোরাশি সৌন্দর্য প্রভায়॥
মনোহর আহা! তাঁরি কার্য সমুদায়।
পাঠাও দরূদ সবে তাঁহারি আত্মায়॥

হয্‌রত মুহম্মদের (দঃ) ধর্ম্মীয় উদারতা

যখন বিশ্বময় হিন্দু এবং বৌদ্ধ, য়িহুদী এবং খ্রীষ্টান, এমনকি একই ধর্ম্মের শাখাভুক্ত শৈবশাক্ত এবং বৈষ্ণব, আরিয়ান এবং আথানাসিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী ভীষণ ধর্ম্মকলহে রত ছিল, এমনকি ধর্ম্মের নামে রক্তপাতেও কুণ্ঠিত ছিল না, তখন আরবের মরু-বায়ু প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল —

"তিনি (আল্লাহ্) তোমার জন্য সেই ধর্ম্ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা তিনি নূহের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং যাহা আমি (আল্লাহ্) তোমার প্রতি (হে মুহম্মদ!) প্রত্যাদেশ করিয়াছি এবং যাহা (পূর্ব্বে) ইব্রাহীম, মূসা ও 'ঈসার প্রতি আমি নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, যেন তোমরা ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তাহাতে দলে দলে বিভক্ত না হও।" (কুর্‌আন ৪২।১৩)।

ইহা আল্লাহের বাণী তাঁহার প্রেরিতপুরুষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয্‌রত মুহম্মদ (দঃ) এর প্রতি। ইহার মর্ম্ম এই হইল যে পৃথিবীর সমস্ত সত্য ধর্ম্মের মূল উৎস স্বয়ং বিশ্বপালক আল্লাহতা'আলা। সুতরাং সকল সত্য ধর্ম্মাবলম্বী মূলতঃ এক। তাহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়া অনুচিত।

শাস্ত্রীয় ভিত্তি

Encyclopedia of Religion and Ethics-এর Tolaration শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক সত্যই বলিয়াছেন — "The recognition of rival religious systems as possessing a Divine revelation gave to Islam from the outset a theological basis for the toleration of non-Muslims" অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মবিধিসমূহের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বিদ্যমান আছে, ইহা স্বীকার করিয়া আদি হইতেই ইসলাম অমুসলমানদিগের প্রতি উদার ব্যবহারের জন্য এক শাস্ত্রীয় ভিত্তি রচনা করিয়াছিল।

হয্‌রত মুহম্মদের (দঃ) প্রতি আল্লাহের প্রত্যাদেশ হইয়াছিল — "এবং বল, আল্লাহ্ যে কোনও গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন, আমি (মুহম্মদ) তাহাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করিব। আল্লাহ আমাদের প্রভু এবং তোমাদের প্রভু এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্ম্মফল ও তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম্মফল। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোন তর্ক নাই। আল্লাহ্ আমাদিগকে একত্র করিবেন এবং তাঁহার দিকেই প্রত্যাগমন।"

(কুর্‌আন ৪২।১৫)

ধর্ম্মের নাম

হয্‌রত মুহম্মদের (দঃ) প্রচারিত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য তাঁহার বিশ্বজনীন উদারতায়। তাঁহার পূর্ব্বে প্রচারিত ধর্মগুলি প্রায়শঃ হয় জাতির নাম অনুসারে, আর না হয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণের নাম অনুসারে অভিহিত হইয়াছে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, য়িহুদী ও হিন্দু ধর্ম্মগুলি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু হয্‌রত মুহম্মদের (দঃ) প্রচারিত ধর্মের নাম মুহম্মদীয় ধর্ম নহে। 'Mahomedanism' শব্দটি অমুসলমানের রচিত, তাহা সম্পূর্ণরূপে কুর'আন-বহির্ভূত ও ভ্রান্তিজনক। উহার নাম ইস্‌লাম। ইহার অর্থ আল্লাহের নিকট আত্মনিবেদন বা সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার, যাহার পরিচয় বিশ্বের শান্তি-সৃষ্টিতে এবং হিতসাধনে। সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি এই আনুগত্য মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় সমস্ত বিশ্বে বিদ্যমান। ইস্‌লামের অপর নাম ফিৎরৎ বা মানব-ধর্ম।

কুর্‌আন এবং হয্‌রত মুহম্মদ (দঃ) সেই বিশ্বজনীন ধর্মের দিকে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানবকে আহ্বান করিয়াছেন। কুর্‌আনের উক্তি —

"কি তাহারা আল্লাহের ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করে ? আর যে কেহ দ্যুলোকে ও ভূলোকে আছে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহাব একান্ত আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বল, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহের প্রতি এবং তাহার প্রতি যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার প্রতি যাহা ইব্রাহীম, ইস্‌মাঈ'ল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং ইসরাঈল বংশীয়গণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার প্রতি যাহা মুসা এবং 'ঈসা এবং ধর্ম্মের বার্ত্তাবহদিগকে তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে প্রদত্ত হইয়াছে; আর আমরা তাঁহার একান্ত অনুগত।"

(কুর্‌আন ৩।৮২।৮৩)।

উদ্ধৃত উক্তিতে যে স্থলে আছে "একান্ত আনুগত্য স্বীকার করে' এবং "একান্ত অনুগত' সে-স্থলে মূলে আছে "আস্‌লামা" এবং "মুসলিমূন্‌"। ইহা হইতে ধর্ম্মের নাম ইস্‌লাম এবং তাহার অনুসরণকারীগণের নাম মুস্‌লিম।

এই ইসলামকে লক্ষ্য করিয়া কুর্‌আন বলিতেছেন— "আর যে ব্যক্তি ইস্‌লাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম অনুসন্ধান করে, কিছুতেই তাহা তাহার নিকট হইতে গৃহীত হইবে না। এবং সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে !" (ঐ।৮৪)।

জার্মানির শ্রেষ্ঠ মনীষী লেখক গ্বেটে যেন ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন —

'Wen Islam Gott ergeben heisst.
In Islam leben und starben wir alle.'

অর্থাৎ যদি ইসলামের অর্থ ঈশ্বরে আত্মনিবেদন হয়, তবে আমরা সকলেই ইসলামে বাঁচি এবং মরি।

যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন — 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।

সকল অহংকার হে আমাব
ডুবাও চোখের জলে।'

তখন তিনি প্রকারান্তরে ইসলামেরই কামনা করেন।

ধর্মকলহে রত য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণকে লক্ষ্য করিয়া কুর্‌আন বলিতেছেন "এবং তাহারা বলে য়িহুদী কিংবা খ্রীষ্টান না হইলে কেহই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা তাহাদের খেয়াল। বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণপত্র উপস্থিত কর। না না, যে ব্যক্তি তাহার আননকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করে এবং হিতাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহার প্রতিদান তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট আছে, তাহার কোন ভয় নাই, সে শোক পাইবে না।" (ঐ ২।১১,১১২)।

সমস্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অনুবর্তিগণ বস্তুতঃ একই ধর্ম্মমণ্ডলী; কিন্তু তাহারা প্রবৃত্তিবশে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। আল্লাহের উক্তি — "(হে প্রেরিত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ) নিশ্চয় তোমাদের এই সম্প্রদায় এক সম্প্রদায় এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু। অতএব আমাকে তোমরা সভক্তি ভয় কর। অনন্তর তাহাদের অনুবর্তিগণ নিজেদের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক দল তাহাদের নিজের যাহা আছে, তাহাতে আহ্লাদিত।" (ঐ ২৫-৫২, ৫৩)।।

অন্যত্র বলা হইয়াছে — "(অংশিবাদিগণ) যাহারা তাহাদের ধর্মকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়াছে এবং এক এক সম্প্রদায় হইয়াছে, প্রত্যেক দল তাহাদের নিজের যাহা আছে তাহাতে আহ্লাদিত।" (ঐ ৩০।৩২)।

ধর্ম্মে বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ

সমস্ত মতানৈক্য ধীরভাবে সহ্য করিতে কুর্‌আন উপদেশ দেয়। "এবং যদি তোমার প্রভু চাহিতেন তবে নিশ্চয় ধরাতলে যাহারা আছে সকলেই ধর্ম্মবিশ্বাসী হইত। তবে কি তুমি ধর্ম্মবিশ্বাসী হইবার জন্য লোকদের উপর বল প্রয়োগ করিবে?" (ঐ ১০।৯৯)। কুর্‌আন বজ্রনিনাদে বলিতেছেন — 'লা ইক্‌রাহা ফিদ্‌দীন' (ঐ ২।২৫৬) — ধর্ম্মে বল প্রয়োগ নাই। কুর্‌আনের ধর্ম্মে তরবারির স্থান নাই। এক হাতে কুর্‌আন, অন্য হাতে তরবারি — এই চিত্র ইসলামের শত্রুগণের অঙ্কিত।

হয্‌রত মুহম্মদের (দঃ) জীবনে আমরা দেখি যখন বারংবার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য য়িহুদী বনী নযীর গোষ্ঠীকে মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ প্রদত্ত হয়, তখন মদীনাবাসী মুসলমানগণের যে সকল সন্তান পূর্ব্বে য়িহুদীধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে জোর করিয়া মুসলমান করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু আঁ-হয্‌রত এরূপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন— "ধর্ম্মে বলপ্রয়োগ নাই।" (হাদীস আবুদাউদ, নিসা'ঈ ও ইবনে হাব্বান)। এক মুসলমানের দুই পুত্র খ্রীষ্টান ছিল। সে তাহাদিগকে বল-পূর্ব্বক মুসলমান করিতে আঁ-হযরতের অনুমতি চাহিয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—"ধর্মে বলপ্রয়োগ নাই।"
(তফসীর ইবনে জরীর)

হয্‌রত মুহম্মদ (দঃ) স্বীয় পিতৃব্য আবু তালিবের সহিত তাঁহার মরণকাল পর্যন্ত অতি সদ্ভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শৈশবের ধাত্রী হালীমাকে মায়ের

ন্যায় ভক্তি করিতেন। অথচ আবু তালিব যাবজ্জীবন পৌত্তলিক ছিলেন এবং হালীমা বহু পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরতের পারিবারিক জীবনের এই উদারতা তাঁহার বহির্জ্জীবনেও পরিস্ফুট ছিল।

তিনি স্বয়ং য়িহূদীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতেন। য়িহূদী ও খ্রীষ্টানগণের অন্নগ্রহণ এবং তাঁহাদের একশ্বেরবাদিনী কন্যাগণের পাণিগ্রহণ কুর্আনে বৈধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হযরতের স্ত্রী সুফিয়া য়িহুদী জাতীয়া এবং মরিয়ম খ্রীষ্টান জাতীয়া ছিলেন। পরে তাঁহারা ইস্লাম গ্রহণ করেন।

অমুসলমানদের ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা

তিনি নজরানের খ্রীষ্টানদিগকে যে সনদ (charter) দিয়াছিলেন, তাহাতে লিপিবদ্ধ ছিল যে, যে পর্যন্ত তাহারা স্বীয় অঙ্গীকারে স্থির থাকিবে, তাহাদিগের গির্জ্জা, ধর্মাচার এবং সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের রক্ষণাধীনে থাকিবে এবং তাহারা নির্ব্বিঘ্নে সকল প্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

হযরত মুহম্মদ (দঃ) হিরাক্লিয়াস এবং অন্যান্য খ্রীষ্টান রাজগণের নিকট যে-সকল পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে কুর্আনের এই বাণী উদ্ধৃত থাকিত — "বল, হে গ্রন্থ-অধিকারিগণ, তোমরা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সাধারণ একটি কথার দিকে এস. তাহা এই যে আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রতিপালক প্রভুরূপে গ্রহণ করিব না। যদি তাহারা পশ্চাদ্গামী হয়, তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলিম (আল্লাহের একান্ত অনুগত)।" (ঐ ৩—৭৩)

যিম্মীর প্রতি ব্যবহার

মুসলমান শাসনাধীনে বিধর্মী প্রজাদিগকে যিম্মী বা চুক্তি-আবদ্ধ বলা হইত। তাহাদের সম্বন্ধে আঁ-হযরতের উক্তি এইরূপ — "যে ব্যক্তি যিম্মীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিবে এবং তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা তাহার উপর চাপাইবে আমি পরলোকে তাহার জন্য অভিযোগকারী হইব।" বাস্তবিক ইসলামের আইনে বিধর্মী প্রজার ধনপ্রাণ মুসলমান প্রজারই ন্যায় সমানভাবে পবিত্র ও রক্ষণীয়।

হযরত মুহম্মদ (দঃ) কুর্আনে প্রচার করিয়াছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জন্য নবী আসিয়াছেন এবং তাঁহারা স্বজাতির ভাষায় ঐশী বাণী প্রচার করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের প্রতি কুর্আনের বাণী কি উদার।

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি (আল্লাহ) এক এক ব্যবস্থা এবং পন্থা নিদ্দিষ্ট করিয়াছি। যদি আল্লাহ চাহিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে একই সম্প্রদায় করিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে তিনি পরীক্ষা করিতে চাহেন। অতএব ভাল কার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর। আল্লাহের দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্ত্তন হইবে। তখন তিনি তোমরা যাহাতে মতভেদ করিতেছিলে তাহার বিষয় জানাইয়া দিবেন।" (ঐ ৫—৪৯)

রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ ॥ মদীনা, সীরাত সংখ্যা, ১৯৬১, রবিউল আওয়াল, ১৩৮১ হিঃ ॥

সত্যের সংগ্রামে মহানবী (সঃ)

সে জয় জয়ই নয়, যাহা বিনাযুদ্ধে অনায়াসে লাভ হয়। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সেই জয়ের জন্য যুগে যুগে সত্যের পূজারীদিগকে অসত্যের বিরুদ্ধে কি কঠোর যুদ্ধ করতে হয়েছে! হযরত ইব্‌রাহীম, হযরত মূসা আলায়হিমুস্ সালাম প্রভৃতি পয়গম্বরগণকে যে কঠোর সাধনা করতে হয়েছে, তা বাইবেলে ও কুর্‌আনে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফার (সঃ) জীবনী প্রাচীন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। যিনি ছিলেন আকৃতিতে পরমসুন্দর, প্রকৃতিতে পরমসুন্দর, যাঁর হৃদয় ছিল প্রেমময়, বাণী ছিল মধুময় তাঁকে কে না ভালবাসবে? বাস্তবিক হযরত ছিলেন প্রাথমিক জীবনে সমস্ত দেশবাসীর পরমপ্রিয়। সাধারণে এই আবুল কাসিমকে খেতাব দিয়েছিল আল্‌আমীন (বিশ্বাসী) ও আস্‌সাদিক (সত্যবাদী)।

চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এইরূপে আঁ-হযরত ছিলেন সকলের পিয়ারা, সকলের দুলারা। কিন্তু যখন আল্লাহের আদেশে তিনি ঘোষণা করলেন উদাত্ত কণ্ঠে — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্ অর্থাৎ ব্যতীত আল্লাহ কোন দেবতা নেই, মুহম্মদ হলেন আল্লাহের প্রেরিত ধর্মপ্রচারক, — এই চিরসত্য ও নতুন বাণী আরববাসীর কানে বিষ ঢেলে দিলে। প্রথমে তারা প্রলোভন দেখিয়ে সত্যের পথ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে চাইলে। 'উৎবা বিন্ রবিয়া' এক কুরাইশ প্রধান তাঁকে একদিন নির্জনে পেয়ে বল্‌লে, "হে ভাতিজা, তুমি এ কি গণ্ডগোল আরম্ভ করেছ? আমরা বাপদাদার কাল থেকে লাত, মানাত, 'উয্‌যাঃ, হাবল প্রভৃতি ৩৬০ দেবদেবীর পূজা করে আসছি, তুমি বল কিনা এরা কিছুই নয় — কেবল নাম মাত্র। আচ্ছা! তোমার মাথায় যদি কোনও ব্যারাম হ'য়ে থাকে, তবে ঈরানে, রূমে, হিন্দুস্তানে যত বড় বড় হাকিম আছে, তাদের দ্বারা তোমার চিকিৎসা করাব। আর যদি তুমি কোন টাকাকড়ি চাও, তবে আমাদের যত সোনা-রূপা তোমার পায়ে ঢেলে দেব। আমরা কখনও কোনও রাজা-বাদশাহ্ মানি নি; তবে তুমি যদি বাদশাহ্ হ'তে চাও, আমরা তোমাকে বাদশাহ্ করব।" তার পরে 'উৎবা একটু মুচকি হেসে বল্‌লে, "তুমি ত এক বুড়ীকে নিয়ে ঘর করছ,যদি বল, তবে আরবের যত সুন্দরী কুমারী আছে, তাদের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দি। কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি তোমার মত প্রচার ছেড়ে দাও।"

হযরত ধীরভাবে 'উৎবার কথা শুনলেন, তারপরে বল্‌লেন, "চাচা, আমার মাথায় কোনও গোলমাল নেই; তোমাদের টাকা-কড়ি তোমাদেরই থাকুক, তাতে আমার কোনও দরকার নেই; আমি দুনিয়ার বাদশাহ্ হ'তে চাই না, আর সুন্দরী রমণী বিবাহ

করার মতলবও আমার নেই। আমি আল্লাহের আদেশ পেয়ে তোমাদেরকে বলছি, তোমরা মনে প্রাণে এই কথা মানো, — "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর্ রসূলুল্লাহ্।" 'উৎবা তখন বিড় বিড় ক'রে বলতে বলতে চ'লে গেল, "এটা একটা বদ্ধ পাগল। একে নিশ্চয়ই শক্ত জিনে পেয়েছে।"

কুরাইশরা যখন দেখল যে প্রলোভন দিয়ে মহানবীকে সত্যের পথ থেকে হটানো যাবে না, তখন তারা অন্য ফন্দি আঁটল। তারা কয়েকবার আঁ-হযরতের পিতৃতুল্য স্নেহপ্রবণ চাচা আবু তালিবের কাছে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলে, যেন তিনি তাঁর ভাইপোকে এই সর্বনেশে কাজ থেকে বারণ করেন। আবু তালিব হযরতকে এ সম্বন্ধে কখনও কিছু বলেছিলেন কি না, তা আমরা জানি না। কিন্তু হয্‌রত আগের মত পুরাদস্তর প্রচার-কার্য চালাতে লাগলেন। তিনি হাটে-ঘাটে-মাঠে, কাবার প্রাঙ্গণে প্রচার করতে লাগলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর্ রসূলুল্লাহ। এবার কুরাইশ প্রধানরা মহাবিরক্ত হ'য়ে আবু তালিবের কাছে এল। তারা তাঁকে শাসিয়ে বললে, "যদি আপনি আপনার ভাতিজাকে না থামান, তবে অবশ্য আমাদেরকে বাধ্য হ'য়ে আপনার ও আপনার এগানাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। আপনাদেরকে হ'তে হবে একঘরে।"

অগত্যা আবু তালিব একদিন আঁ-হযরতকে ডেকে বল্‌লেন, "শোন ভাতিজা, যদি তুমি ধর্ম প্রচার না ছাড়, তবে সমস্ত কুরাইশ গোষ্ঠী আমাদেরকে একঘরে করবে। তাতে বুঝতে পার, আমাদের কি দশা হবে। বাবা, তুমি যে মতে আছ, সেই মতেই থাক; কিন্তু সেটা হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে প্রচার ক'রে লাভ কি? তাতে কেবল গণ্ডগোলই সৃষ্টি হচ্ছে। তুমি যদি না থাম, তবে আমাকে বাধ্য হ'য়ে তোমাকে ছাড়তে হবে। সেটা খুবই দুঃখের বিষয় হবে; কিন্তু উপায় কি? এখন বল তুমি কি করবে?" হযরত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "চাচাজান, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ দিয়ে এ প্রচার ত্যাগ করতে বলে, আমি নিশ্চয়ই বলছি, যে পর্যন্ত আমার ধড়ে জান থাকবে, সে পর্যন্ত আমি কিছুতেই এই প্রচার কাজ থেকে নিবৃত্ত হব না, তাতে আমার নসীবে যা থাকে তাই হবে। চাচাজান, যদি আপনি আমাকে ছাড়েন, আল্লাহ্ কখনই আমাকে ছাড়বেন না।" এই ব'লে তিনি অশ্রুসজল চক্ষে বিদায় নিচ্ছিলেন। আবু তালিব তাঁর হাত ধ'রে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হোক, আমি তোমাকে কখনও ছাড়ব না।"

এর পর সমস্ত কুরাইশ গোষ্ঠী আঁ-হযরত সমেত আবু তালিবের পরিজনদেরকে একঘরে ক'রে দিলে। সে কি সাংঘাতিক ব্যাপার! কেউ তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে না, খাওয়া-পেওয়া করবে না, তাঁদের কোন জিনিসও তারা কিনবে না। এই বয়কটের ফলে তাঁদের যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল, তা বর্ণনাতীত। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ছেলেমেয়েগুলো চীৎকার করে কাঁদছে, পাড়াপ্রতিবেশীরা কেউ এক টুকরা রুটি বা এক ফোঁটা পানি দিয়ে সাহায্য করে না। তবে সকল মানুষ ত আর পাষাণ নয়!" কুরাইশদের মধ্য থেকে কয়েকজন গোপনে রাতারাতি কিছু খাবার-দাবার ও পানি! দিয়ে সাহায্য করত। এই ভাবে অতি কষ্টে তাঁদের দিন চলছিল। কুরাইশরা তাঁদের

বয়কটের একরারনামা কাবার ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছিল। একদিন দেখা গেল, সেটা উই পোকায় খেয়ে নষ্ট ক'রে ফেলেছে। তখন কুরাইশরা বললে, "থাক গিয়ে, খেয়ে ফেলেছে আর দরকার নেই। এখন নিশ্চয়ই মুহম্মদ শায়েস্তা হ'য়ে যাবে।"

তখন মুক্ত হ'য়ে হযরত মনে করলেন মক্কার লোক ত আল্লাহের কথা শুনলে না; এখন যাই দেখি, তায়েফের লোক কি করে। তিনি বিশ্বাসী অনুচর যায়দকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফে ইস্‌লাম প্রচার করতে গেলেন। তায়েফবাসীরা হযরতের কথায় কান দিলে না; তার উপর তাঁকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে গ্রাম থেকে বা'র ক'রে দিলে। সমস্ত শরীর তাঁর রক্তাক্ত। রক্তে পায়ের জুতো পর্যন্ত ডুবে গেছে। তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। পরে তিনি অতিকষ্টে উঠে একটি খোরমা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। আল্লাহের কাছে মুনাজাত করলেন, "হে আমার রব্‌, আমি তোমার কাছে আমার ফরিয়াদ জানাই। আমার দুর্বলতার জন্যে আর আমার ইচ্ছার অসারতার জন্যে আমি লোকের চোখে অতি নগণ্য। হে পরম দয়াময়, হে দুর্বলের প্রভু, তুমি আমাকে ছেড়ো না, তুমি আমাকে বেগানার হাতে কিংবা আমার শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিও না। তুমি যদি নারাজ না হও, তবে আমি নিরাপদ। আমি আশ্রয় লই তোমার মুখের জ্যোতিতে, যার দ্বারা সমস্ত আঁধার ঘুচে যায় এবং ইহ-পরলোকে শান্তি আসে। তোমার ক্রোধ যে আমার উপরে না এসে পড়ে। তোমার যেমন মর্যি, আমার মুশকিল আসান কর। কোন শক্তি, কোনও সাহায্য তোমাতে ভিন্ন আর কাউতে নাই।" তারপর তিনি যায়দকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন।

কুরাইশরা ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণের জন্যে হযবত ইয়াসার আর তাঁর স্ত্রী সমিয়াকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলে। তারা তাদের ছেলে 'আমারকে জ্বালাযন্ত্রণা দিতে ক্রটি করলে না। হযরত বিলালকে খালি গায়ে মক্কার বালিতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চিৎ ক'রে শুইয়ে রেখে বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে কত না যন্ত্রণা দিলে। প্রবল পিপাসায় তারা তাঁকে এক ফোঁটা পানিও খেতে দিলে না, খাবার দেওয়া ত দূরের কথা। তিনি কেবল বলতেন, "আহাদুন্‌! আহাদুন্‌!! (এক, এক)"। শেষে হয্‌রত আবূ বকর বিলালের মনিবকে টাকা দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেন।

শিষ্যদের এই সমস্ত দুর্দশা দেখে তিনি তাঁদের হিজ্‌রত্‌ করবার অনুমতি দিলেন। এখন কুরাইশরা মহানবীর জীবন নাশের জন্যে ষড়যন্ত্র করলে। আল্লাহের হুকুমে তিনি সেই খবর জানতে পেরে এক নিশীথ রাতে যখন কাফিররা তাঁর বাড়ী ঘিরে ছিল, তিনি এমন নিঃসাড়ে বেরিয়ে এলেন যে কেউ টের পেলে না। তিনি হয্‌রত আবূ বকরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী সওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। পাছে তাঁর পায়ের চিহ্ন দেখে কাফিররা তাঁকে চিনতে পারে এই জন্যে আবূ বকর তাঁকে কাঁধে বসিয়ে এনেছিলেন। পাহাড়ের গুহায় রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হয্‌রত আবূ বকরের রানে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। গুহার সমস্ত সুরাখগুলি আবূ বকর নিজের কাপড় ছিঁড়ে বুজিয়ে দিয়েছিলেন। কাপড়ের অভাবে একটি গর্ত বুজাতে পারেন নি, সেখানে পায়ের তলা দিয়ে আট্‌কে রেখেছিলেন। একটি সাপ তাঁর পায়ের তলায় বার বার ছোবল মারছিল; কিন্তু তিনি হয্‌রতের খাতিরে কিছুতেই পা হটিয়ে

নেন নি। কিন্তু যন্ত্রণায় চোখের পানি তিনি থামাতে পারেন নি। যখন তাঁর রানের উপর শোয়া হয্‌রতের মুখের উপর তাঁর চোখের পানি পড়তে লাগল, তখন হয্‌রতের হাল্‌কা ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বল্‌লেন "আবূ বকর, তুমি কাঁদছ?" আবূ বকর সমস্ত ঘটনা খুলে বল্‌লেন। হয্‌রত বললেন, "তুমি পা ছেড়ে দাও। আবূ বকর গর্ত থেকে পা সরালেন, সাপ চ'লে গেল। হয্‌রত তাঁর বদন মুবারকের থুথু আবূ বকরের ক্ষতস্থানে দিলেন। তিনি আরাম পেলেন। তিনদিন সেই গুহায় তাঁরা থাকলেন। আবূ বকরের এক বিশ্বাসী চাকর রাত্রিতে গোপনে তাঁদের খানাপিনা দিত। হযরত আবূ বকর বল্‌লেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! আমরা দু'জন। আর দুশমন অগুন্‌তি। আমাদের কি হবে?" রসূললুল্লাহ দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লেন, "লা তাহ্‌যান্‌, ইন্নাল্লাহ মা'আনা।" (দুঃখ ক'রো না, আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে আছেন)। তারপর তাঁরা মদীনার দিকে হিজর্‌ত করলেন।

মদীনায় এসেও হয্‌রত শান্তি পেলেন না। কুরাইশরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল, তারা দুনিয়াতে ইসলামের নাম-নিশানা রাখবে না। তাই তারা মক্কা থেকে মদীনায় এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ ক'রে দিলে। প্রথম বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হ'ল। ৩১৩ জন মুসলমান এক হাজার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত কুরাইশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে তাদেরকে হারিয়ে দিলে। এর পরে আবার কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করলে। উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের পরাজয় হ'ল। এ ছিল আল্লাহের মহাপরীক্ষা। হয্‌রতের চাচা হাম্‌যা এবং আরও কয়েকজন সাহাবা শহীদ হলেন। রসূলুল্লাহের শরীরের নানা স্থানে জখম হল। তাঁর চারটি দাঁত ভেঙে গেল। মুখ ও শরীর রক্তে ভিজে গেল। কাফিররা বিজয়োল্লাসে মক্কায় ফিরে গেল।

সাহাবারা হযরতকে বলেন, "আমাদের কোনও অপবাধ নেই; আমরা আল্লাহকে এক বলে জেনেছি এবং কেবলই তাঁরই 'ইবাদত করছি, এই জন্যে কাফিররা আমাদের উপর এত অত্যাচার করছে। আপনি তাদেরকে বদ্‌দোয়া করুন।" আঁ-হযরত হাত তুল্‌লেন, সাহাবারাও হাত তুল্‌লেন। তিনি বল্‌লেন, "আয় আল্লাহ্‌! তুমি আমার কওমকে সুপথ দেখাও, কারণ তারা ত অজ্ঞান।" সাহাবারা আশ্চর্য হ'য়ে বল্‌লেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্‌, আপনি ত ওদের জন্যে দোয়া করলেন।" রসূলুল্লাহ্‌ ধীরভাবে বল্‌লেন, "আল্লাহ্‌ আমাকে অভিসম্পাতকারী ক'রে পাঠান নি; তিনি আমাকে সমস্ত জাহানের জন্যে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন।" এরপর আরও কত যুদ্ধ হল, কত সাহাবা শহীদ হলেন; কিন্তু অবশেষে মক্কা জয় হ'ল, ইসলামের জয় হ'ল। সমস্ত আরব ইস্‌লামে দীক্ষিত হ'ল।

রেডিও পাকিস্তান, ঢাকার সৌজন্যে, ১০/৬/৬২ ইং।

মহানবীর (সঃ) উদারতা

মহান কুরআনের শিক্ষা —

"ভাল এবং মন্দ সমান নয়। যা অতি ভাল তা দিয়ে (মন্দকে) দূর কর। তা হ'লে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হবে যেন তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এবং যারা ধৈর্যশীল, তারা ছাড়া কেউ এটা লাভ করে না।" (৪১, ৩৪, ৩৫)।

এই মহাশিক্ষা মহানবী (সাল্লা'ল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত করেছিলেন। এই জন্যই কুরআন পাকে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে– وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থাৎ এবং নিশ্চয় তুমি মহা চরিত্রবান। (৬৮।৪)

তিনিও বলতেন — إِنِّي بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি চরিত্রের মহত্ত্ব পূর্ণ করতে জন্মেছি। (হাদীস)

মহানবীর জীবনী থেকে বিধর্মী শত্রুর প্রতি তাঁর ঔদার্যের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রথমে দেখুন, আঁ-হযরত আল্লাহের আদেশে প্রিয় জন্মভূমি চিরতরে ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। সঙ্গে হযরত আবূ বকর (রাঃ)। বিধর্মীরা ঘোষণা ক'রে দিয়েছে, যে হযরতের মুণ্ড এনে দিবে কিংবা তাকে ধরে আনবে, তাকে একশত উট বখ্‌শিশ দেওয়া হবে। পুরস্কারের লোভে সুরাকা বিন্ মালিক নামে এক বিধর্মী বর্শা তীর ধনুক নিয়ে ঘোড়সওয়ার হ'য়ে তাঁর সন্ধানে বেরল। সে আঁ-হয্‌রত ও আবূ বকরকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে চীৎকার ক'রে বল্‌লে, "হে মুহম্মদ! আজ আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে?" তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বল্‌লেন, "আল্লাহ"। সুরাকা প্রায় কাছে এসে পড়েছে। আল্লাহের মরযী বেলে মাটিতে তার ঘোড়ার সামনের দুই পা মায় পেট গেড়ে গেল। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে হয্‌রতের বদ্ দোয়াতেই এইরূপ হয়েছে। সে ঘোড়ার মুক্তির জন্য হয্‌রতের দোয়া চাইলে। দয়াল নবী দোয়া করলেন। সে ঘোড়া ছুটিয়ে কাছে এল। রসূলুল্লাহ এই আততায়ী শত্রুকে অম্লান বদনে মার্জনা করলেন। সে মুসলমান হ'ল না; কিন্তু বিদায় কালে তাকে একটি অভয় পত্র লিখে দিয়ে হয্‌রত ভবিষ্যদ্‌বাণী ক'রে বল্‌লেন, "সুরাকা, তুমি যে দিন ঈরাণের বাদ্‌শাহের হাতের কঙ্কণ নিজের দুই হাতে পরবে, তখন কেমন খুশী হবে?" এই সুরাকা বহুদিন পরে আঁ-হযরতের হাতে ইস্‌লাম গ্রহণ করে। হয্‌রত 'উমরের সময়

যখন পারস্য জয় হয়, তখন লুটের মালের মধ্যে বাদশাহের হাতের কঙ্কণ ছিল। হয্‌রত 'উমর সুরাকার হাতে নিজে কঙ্কণ পরিয়ে দেন। রসূল্লাহের সুসংবাদ সে দিন পূর্ণ হয়।

উহুদের যুদ্ধে সত্তর জন মুসলমান শহীদ হন। স্বয়ং রসূলুললাহ্‌ও আহত হন। তাঁর চেহারা মুবারক রক্তে রঞ্জিত হয় এবং চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায় আর নিচের ওষ্ঠখানি কেটে যায়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয্‌রত আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলেন, "আল্লাহহুম্মা হ্‌দী কওমী, ফা-ইন্নাহুম লা য়া'লমূন"— হে আল্লাহ্‌, তুমি আমার কওমকে সুপথ দেখাও, কারণ তারা বুঝতে পারে না। দেখুন আঁ-হযরত অত্যাচারী বিধর্মীদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আর তাদেরকে নিজের কওম বলে পরিচয় দিলেন। পাকিস্তানের মুসলমানদের এতে ভাববার বিষয় আছে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) কখনও নিজের শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতেন না। ক্ষমাই ছিল তাঁর স্বভাব। এক যুদ্ধকালে তিনি দুপহর বেলায় এক গাছের ডালে তাঁর তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে আরাম করছিলেন। দূর থেকে দা'সূর নামে এক বিধর্মী বীর তাঁকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে বল্‌লে, এইত সুবর্ণ সুযোগ! আমাদের ধর্মের শত্রুকে একেবারে সাবাড় করে দিই। সে নিঃসাড়ে কাছে এসে তলোয়ার ঘুরাতে ঘুরাতে বলতে লাগল, "হে মুহম্মদ, কে তোমাকে রক্ষা করবে?" তার চীৎকারে হয্‌রতের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ মেলে দেখলেন সামনে শত্রু খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে। তিনি ভীত হলেন না। সে তখন বললে, "হে মুহম্মদ, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?" হয্‌রত তখন উচ্চস্বরে বললেন, "আল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌!! আল্লাহ্‌!!!" আল্লাহের নাম শুনে তার বুক কেঁপে উঠ্‌ল। তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। হয্‌রত তৎক্ষণাৎ তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে বললেন, "ওহে! তোমাকে এখন আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?" সে বললে, "হায়! হায়! কেউই নাই।" হয্‌রত বললেন, "তুই দেখলি না, কে আমাকে তোর হাত থেকে রক্ষা করলে! যা, আমি তোকে মাফ করে দিলুম।" এই ঘটনার পরে সে ইস্‌লামে দীক্ষিত হয়েছিল।

হয্‌রত দাওয়াত কবুল করতেন, তাতে স্বধর্মী বিধর্মী কোনও ভেদ করতেন না। বাস্তবিক, ছুঁৎমার্গ যে ইস্‌লাম বিরোধী, হয্‌রত নিজের জীবনে তার পরিচয় দিয়েছেন। যয়নাব নামে এক ইহুদী স্ত্রীলোক তাঁর কাছে খাবার জন্যে একটা তাজা বকরী পেশ করে। হয্‌রত এক টুকরা গোশ্‌ত মুখে দিয়েই থু! থু! ক'রে ফেলে দিলেন। তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ "খবরদার। এতে বিষ আছে।" ইতঃপূর্বেই কিন্তু বিশর নামে এক সাহাবী সেই বিষাক্ত গোশ্‌ত খেয়ে ফেলেছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁর শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়, তিনি বিবর্ণ হয়ে পড়েন। যয়নাবকে তাঁর সামনে ধরে আনা হ'ল। শিষ্যরা চাইল তখনই মুণ্ডুপাত করে। যয়নাব নিজের দোষ স্বীকার ক'রে বললে, সে প্রতিহিংসাবশে এই কাজ করেছে। সে মনে করেছিল, যদি হযরত আল্লাহের সত্য-নবী হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বেঁচে যাবেন। এখন সে হযরতকে সত্য-নবী ব'লে বিশ্বাস ক'রে মুসলমান হ'ল। এর পরে যখন বিশর মারা যায়, তখন অবশ্য হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু হযরত প্রথমেই নিজের ব্যাপারে তাকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছিলেন। বাস্তবিক তিনি ব্যক্তিগত অন্যায় অত্যাচারের দরুন

কখনও কাউকে শাস্তি দেন নি। এ কথা হযরত 'আই'শাঃ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমরা আগের ঘটনাতেও তাঁর এই ক্ষমাশীলতা দেখেছি।

আঁ-হযরতের ক্ষমাশীলতার উজ্জ্বল উদাহরণ পাই আমরা তাঁর মক্কা-বিজয়ের ঘটনায়। মক্কার বিধর্মীরা তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে, তারা তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে কেবল ইসলাম গ্রহণের কারণে হত্যা করেছে, তারা দুর্বল মুসলমানদের উপর কত না জোর জুলুম করেছে, মক্কা ত্যাগ করলেও তারা পৃথিবীতে মুসলমানদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেবার জন্য কত না যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, কত না মুসলমানকে যুদ্ধে শহীদ করেছে। কিন্তু আল্লাহের ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল —

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ - اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا - ۝

অর্থাৎ এবং (হে মুহম্মদ!) বল, সত্য এসেছে এবং অসত্য ধ্বংস হয়েছে। নিশ্চয়ই অসত্য ধ্বংসশীল। (১৭।৮১)।

শেষে ২১ বৎসর পরে মক্কা জয় হল। এ বিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক অপূর্ব বিজয়। কোনও সৈন্যবাহিনী কোনও নগর অধিকার করলে, রক্তের স্রোত বয়ে যেত। কত নারীর উপর অত্যাচার হ'ত। লুট-পাটের ত কথাই ছিল না। কিন্তু এ ছিল শান্তিপূর্ণ বিজয়। মক্কাবাসীরা ভেবেছিল, তাদের পূর্ব অপরাধের জন্য আজ তাদের ভাগ্যে না জানি কি ঘটে। সমবেত মক্কাবাসীদেরকে তিনি বললেন, "তোমরা কি বুঝতে পেরেছ, আমি আজ তোমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করব?"

তারা সমস্বরে বললে, "ভাল। হে সম্মানিত ভাই, হে সম্মানিত ভাতিজা, আমরা ভাল প্রত্যাশা করি। হে সম্মানিত ভাই, হে সম্মানিত ভাতিজা, তুমি ক্ষমতা পেয়েছ। আমরা অপরাধী, তবু আমরা ভাল প্রত্যাশা করি।" তখন হয্‌রত ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, "আমি আজ তোমাদের সেই কথা বলি, যা হয্‌রত ইয়ুসুফ তাঁর ভাইদের বলেছিলেন —

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ - ۝

আজ তোমাদের উপর আমার কোনও নালিশ নেই! আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে মাফ করুন ; কেন না তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু (১২।৯২)। যাও, তোমরা সকলে মুক্ত।"

করুণাময় আল্লাহ্‌তা'আলা হয্‌রত সম্বন্ধে সত্যই বলেছেন —

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

অর্থাৎ আমি তোমাকে বিশ্ববাসীদের প্রতি দয়াস্বরূপে পাঠিয়েছি এ ভিন্ন নয় (২১।১০৭)। যদি কেউ বলেন যিনি এত দয়ালু ও ক্ষমাশীল, তিনি জিহাদ করলেন কেন? আমাদের মনে রাখতে হবে আঁ-হযরত কেবল ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, তিনি রাষ্ট্রীয় নেতাও ছিলেন। বাস্তবিক জিহাদ হচ্ছে ধর্মের শত্রু ও স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন। জিহাদ মানব জাতির রক্ষার ও শান্তির জন্য। আজ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও এই ইসলামী নীতি গ্রহণ করেছে।

রেডিও পাকিস্তান।। ঢাকা, ৫-৮-৬২ ইং এবং মদীনা, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৯৬২।

হয্‌রত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)

নিখিল মুস্‌লিম জমাতের মধ্যে আঁ হয্‌রত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ও সাল্লামের পরই যাঁর স্থান, তিনি হয্‌রত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু। তিনি রসূল পাকের একবংশীয় ছিলেন আর বয়সে তাঁর চেয়ে দুই বৎসর কয়েক মাস ছোট ছিলেন। তার পিতা মাতার নাম আবূ কুহাফাঃ এবং সল্‌মা ছিল। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল 'আব্‌দুল কা'বাঃ। তিনি বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। আঁ হয্‌রত তখন তাঁর নাম রাখেন 'আব্‌দুল্লাহ্। তিনি নবীপত্নী হযরত 'আই'শাঃ সিদ্দীকার পিতা ছিলেন। এই জন্য তাঁর উপাধি হয় আবূ বকর অর্থাৎ কুমারীর পিতা। এই নামেই তিনি বিখ্যাত হন।

ইস্‌লাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি আঁ হয্‌রতের সঙ্গী ছিলেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। যখন তিনি মুসলমান হন, তখন তাঁর তহবীলে চল্লিশ হাজার দির্‌হাম ছিল। তিনি সে সমস্ত ইস্‌লামের খিদমতে ব্যয় করেন। তিনি পৌত্তলিকতার সময়েও অত্যন্ত চরিত্রবান্ ছিলেন। তিনি কখনও মদ স্পর্শ করেন নি। খেলাধূলার মধ্যে তিনি একমাত্র কবিতা আবৃত্তি ভালবাসতেন।

নবীএ করিমের নবুওতের পূর্বে হয্‌রত আবূ বকর এক স্বপ্ন দেখেন। যেন এক আলো আস্‌মান থেকে নেমে কা'বা শরীফের ঘরে পড়ল। যাতে ক'রে মক্কার সকল ঘর আলোকময় হ'য়ে গেল। তারপর সেই আলো হয্‌রত আবূ বকরের ঘরে আস্‌তে তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি এর ব্যাখ্যা এক ইহুদী 'আলিমের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। তিনি বলেন, "এটা একটা এলোমেলো স্বপ্ন, এর কোনও মাথামুণ্ডু নেই।" এর কিছু দিন পরে তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া দেশে যান, সেখানে বুহয়রাহ্ নামে এক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, "আপনি কে?" হয্‌রত আবূ বকর বলেন, "তিনি কুরাইশ বংশের একজন লোক।" তখন সন্ন্যাসী বলেন, "খোদা কুরাইশ বংশে এক নবী পাঠাবেন। আপনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর উযীর হবেন, পরে তাঁর খলীফা হবেন।" যখন রসূলে করীম ইস্‌লামের নিমন্ত্রণ দিলেন, তখন হয্‌রত আবূ বকর বলেন, "আপনি যে আল্লাহের নবী তার প্রমাণ কি?" আঁ হয্‌রত (সঃ) উত্তর দিলেন, "আমার নবুওতের দলীল তোমার সেই স্বপ্ন, যার ব্যাখ্যায় ইহুদী 'আলিম বলেন, ওটা কিছুই নয়, কিন্তু খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী তার ঠিক ব্যাখ্যা করেন।" আবূ বকর আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে বলেন, "এই স্বপ্নের খবর কে আপনাকে দিলে?" তাতে আঁ হয্‌রত বলেন, "জিব্‌রীল 'আলায়হিস্

সালাম।" তখন আবূ বকর বলেন, "বস্। আর কোনও প্রমাণ দরকার নেই।" তখন তিনি কলেমা পড়ে মুসলমান হন। তিনি যাবজ্জীবন সুখে দুঃখে, দেশে বিদেশে, নগরে যুদ্ধক্ষেত্রে রসূলুল্লাহের (সঃ) সহচর ছিলেন। জীবনান্তেও তিনি তাঁরই পাশে সমাধি লাভ করেছেন।

তিনি যে রসূলে করীমের কতদূর প্রিয়পাত্র ছিলেন, তা' হয্‌রত আবূ স'ইদ খুদ্‌রী বর্ণিত একটি হদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়— রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "যে বক্তি তার জান এবং তার মাল দিয়ে সকলের চেয়ে বেশী আমার উপকার করেছে সে হচ্ছে আবূ বকর। আর যদি আমি আল্লাহ ভিন্ন কাউকে বন্ধুরূপে নিতাম, তবে আবূ বকরকেই নিতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওআ সাল্লামের হিজরতের ঘটনায় আমরা আবূ বকরের আত্মোৎসর্গের একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখি। মক্কার কাফিররা আঁ হয্‌রতকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। তিনি তা' জান্‌তে পেরে আল্লাহের হুকুমে মদীনায় হিজরত করবার এরাদা করলেন। আঁধার রাতে তিনি ঘর থেকে বা'র হলেন। বাড়ীর চারিদিকে শত্রুরা ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু আল্লাহের মর্যী কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। পূর্ব্বের বন্দোবস্ত মত তিনি হয্‌রত আবূ বকরকে তাঁর বাড়ী থেকে ডেকে নিলেন। মক্কার তিন মাইল দূরে সওড় পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপনের জন্যে রওয়ানা হলেন। কা'বাকে দেখে আঁ হয্‌রত বল্‌লেন, "হে মক্কা, তুই আমার বড় প্রিয় স্থান। কিন্তু তোর ছেলেরা আমাকে থাক্‌তে দিলে না।" পথের কাঁটা-কুটার জন্য তাঁর চলতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। তখন হয্‌রত আবূ বকর তাঁকে কাঁধে চড়িয়ে নিলে চল্লেন। প্রথমে তিনি গুহায় নেবে পরিষ্কার করলেন। তাতে অনেক গর্ত ছিল। নিজের জামা ছিঁড়ে গর্ত বোজালেন। জামা শেষ হ'য়ে গেল, তবু একটা গর্ত বোজানো হল না। তিনি আঁ হয্‌রতকে গুহায় ঢুক্‌তে ডাকলেন। আঁ হয্‌রত বড় ক্লান্ত হ'য়েছিলেন। তিনি হয্‌রত আবূ বকরের রানে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। যে গর্তটি বোজানো হয় নি, তাতে তিনি পায়ের এড়ি দিয়ে আটকে রেখেছিলেন। তাতে একটি সাপ ছিল। সে তাঁর পায়ে বার বার ছোবল মারছিল। কিন্তু তিনি, পাছে সাপ আঁ হয্‌রতকে কামড়ায়, এই ভয়ে পা সরান নি। কিন্তু তিনি যন্ত্রণায় চোখের পানি থামাতে পারেন নি। আঁ হয্‌রতের চেহারা মুবারকে চোখের পানি পড়তে তিনি বললেন, "কি আবূ বকর, তুমি কাঁদছ?" আবূ বকর সমস্ত বলতে তিনি বললেন, "তুমি পা ছেড়ে দাও, সাপ আমার কোনও ক্ষতি করবে না।" আঁ হয্‌রতের মুখের থুতুতে আবূ বকরের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হ'য়ে গেল। এই গুহা মধ্যে একবার আবূ বকর ব'লে উঠেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমাদের কি দশা হ'বে? আমরা তো মাত্র দু'জন আর দুশ্‌মন অগুন্‌তি।" তাতে আঁ হয্‌রত দৃঢ়ভাবে বললে, "দুঃখ কি? আল্লাহ্ তো আমাদের সঙ্গে আছেন।" কুরআন পাকে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে —

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফিররা তাকে বা'র ক'রে দেয়; সে ছিল গুহার মধ্যে দু'জনের দ্বিতীয়, যখন সে তার সঙ্গীকে বলে, দুঃখ ক'র না; নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।" (৯।৪০)

তাঁরা তিন রাত তিন দিন সওরের গুহায় থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হ্ন। সেদিন ছিল রবিবার, ৪ঠা রবী'উল আওওল। সমস্ত পথে সঙ্গী ছিলেন হয্‌রত আবূ বকর।

রসূলে করীমের জীবনে ১৯টি জিহাদ সংঘঠিত হয়। এই জিহাদগুলি হ'য়েছিল মুসলমানদের ধন-প্রাণ এবং ধর্ম রক্ষার জন্যে। প্রত্যেক জিহাদে হয্‌রত আবূ বকর রসূলুল্লাহের (দঃ) সঙ্গী ছিলেন। প্রথম জিহাদ বদরে তিনি সৈন্যের দক্ষিণ ভাগের সেনাপতি ছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর পুত্র 'আব্দুর্‌ রহ্‌মান (সে তখনও মুসলমান হয় নি) শত্রুর দলে ছিল। তিনি কিছু গ্রাহ্য না ক'রে তাকে আক্রমণ ক'রেছিলেন। ভাগ্যক্রমে সে যাত্রা সে রক্ষা পায়। যুদ্ধ ছাড়াও তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন।

ইস্‌লামের খিদ্‌মতের জন্য অর্থ ব্যয়ে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সাহাবাদের কাছে ধর্মকর্মের খরচের জন্য চাঁদা চান। প্রথমে হযরত 'উমর (রাঃ) চাঁদা দেন। আঁ হয্‌রত জিজ্ঞাসা করেন, 'উমর তুমি তোমার সংসারের জন্য কি রেখেছ?" তিনি বলেন, "আমার ধনসম্পত্তির অর্ধেক।" তারপর চাঁদা দেন হযরত আবূ বকর। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "আবূ বকর , তোমার সংসারের জন্য তুমি কি রেখেছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহর রসূলকে।"

যখন মি'রাজের বিবরণ শুনে অনেকে ভাবনা চিন্তা করছিল, একি বাস্তবিক, না একটা স্বপ্ন মাত্র। কেউ তাঁকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বিনা দ্বিধায় উত্তর দেন, "আল্লাহ্‌ যাঁর সঙ্গে কথা বলেন, তাঁকে যে আল্লাহ্‌ নিজের কাছে নিয়ে যাবেন আর তিনি যে আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখবেন, তাতে আর সন্দেহ কি? আমি তাঁর ষোল আনা কথা সত্য মনে করি।" তাঁর এই কথায় সকলেই এসম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়। এই থেকে তাঁর উপাধি হয় সিদ্দীক।

তিনি অনেক সময় সমস্ত রাত নমাযে কাটাতেন। অনেক দিন তিনি নফল রোযা রাখতেন। যখন তিনি কুর্‌আন শরীফ তিলাওত করতেন, ভক্তিতে তাঁর চোখের পানিতে বুক ভেসে যেত। একদিকে যেমন ছিল তাঁর 'ইবাদত, অন্য দিকে তেমনি ছিল তাঁর লোকের খিদমত। তিনি মহল্লাবাসীদের কামকাজ নিজে ক'রে দিতেন, পীড়িতের সেবা শুশ্রুষা করতেন, আতুরদের খিদমত করতেন। মক্কায় ইস্‌লামের প্রথম অবস্থায় যে সকল দাসদাসী ইসলাম গ্রহণের জন্য নির্যাতিত হত, তিনি তাদের মনিবদের কাছ থেকে তাদেরকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দিতেন।

হয্‌রত 'উমর (রাঃ) মদীনায় এক অন্ধ বুড়ীকে রাত্রিকালে দেখাশুনা করতেন। কয়েকদিন পরে তিনি দেখলেন যেন কেউ তার কামকাজ আগেই এসে ক'রে যায়। তিনি তাকে ধরবার জন্য সেখানে আগে এসে ওত পেতে রইলেন। দেখেন কি যে হয্‌রত আবূ বকর সেই লোক।

হয্‌রত আবূ হুরয়রাঃ বর্ণনা করেন যে একদিন রসূলে করীম (সঃ) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা রেখেছ?" সকলে

চুপ। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) বিনীতভাবে বল্লেন "আমি।" পুনরায় আঁ হযরত (সঃ) জিজ্ঞাসা করেন, "আজ তোমাদের মধ্যে কে গরীবকে খানা দিয়েছে?" সকলে চুপ রইল। তখন হযরত আবূ বকর আস্তে বল্লেন, "আমি।" আঁ হযরত (সঃ) আবার প্রশ্ন করলেন, "আজ তোমাদের কে পীড়িতের সেবা করেছে?" আবার সকলে চুপ। তখন হযরত আবূ বকর নম্রভাবে বল্লেন, "হে আল্লাহের রসূল, আমি।" এ কথা শুনে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ব'লে উঠ্লেন, "নিশ্চয় যাতে এই তিন গুণ একত্র হয়, সে বেহেশ্তবাসী হবে।" এই সমস্ত নানা সদ্গুণের জন্য আঁ হযরত তাঁকে একটি উপাধি দেন, 'আতীক বা দোযখ হ'তে মুক্ত।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর মরণান্তিক পীড়ার সময়ে হযরত আবূ বকরকে তাঁর স্থানে নমাযের ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি আবূ বকর থাক্তে আর কাউকে এর উপযুক্ত মনে করেন নি। তিনি এইরূপে আঁ হযরতের ইন্তিকাল পর্যন্ত ১৭ ওয়াক্তের নমাযে ইমামতি করেন।

এই সমস্ত গুণের জন্য তিনি আঁ হযরতের (সঃ) ওফাতের পর সর্বসম্মতিক্রমে খলীফাঃ নিযুক্ত হন। তিনি খলীফাঃ হয়ে সর্বপ্রথমে এই ভাষণ দেন, —

"সাহেবান! আমাকে তোমাদের উপর হাকিম নিযুক্ত করা হয়েছে, যদিও আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি ভাল কাজ করি, তোমরা আমাকে মান্য ক'র আর যদি আমি মন্দ কাজের দিকে চলি, তবে তোমরা আমাকে সংশোধন করবে। আমি যে পর্যন্ত আল্লাহ্ ও আল্লাহের রসূলের তাবেদারি করব, তোমরা আমার তাবেদারি করবে, আর যদি আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহের রসূলের নাফরমানি করি, তবে তোমাদের উপর আমার তাবেদারির হক্ নেই।"

খলীফাঃ হবার পূর্বে যেমন তিনি কাঁধে কাপড় নিয়ে দোকানে যেতেন আর কারবার করতেন, খলীফা হবার পর ছয় মাস পর্যন্ত তিনি সেইরূপে দোকানদারি করতে থাকেন। কিন্তু তিজারত আর খিলাফত কিরূপে এক সঙ্গে ভাল ভাবে চলতে পারে? তাই সাহাবীগণ পরামর্শ ক'রে তাঁকে বাৎসরিক আড়াই হাজার দিরহম (প্রায় ৮শ' টাকা) বৃত্তি স্থির ক'রে দেন। তিনি মৃত্যুকালে ওসীয়ত করেন যেন তাঁর সম্পত্তি থেকে বৃত্তির সমস্ত টাকা পরিশোধ করা হয়।

হয্রত আবূ বকরের (রাঃ) খিলাফত সময়ে ইরাক, সিরিয়া ও ফলস্তিনের অধিকাংশ জয় হয়। তিনি প্রথমে হয্রত আবূ 'উবায়দাকে (রাঃ) প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করেন। কিন্তু পরে খালিদ বিন ওলীদকে (রাঃ) প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। সেনাপতিগণের প্রতি তাঁর আদেশ এইরূপ ছিল। —"সৈন্যদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে। তাদের মতামত ও মনোভাব কখনও অগ্রাহ্য করবে না। ছেলে, বুড়ো ও মেয়েলোকের উপর অত্যাচার করবে না। খোর্মা খেজুর গাছ কাটবে না। ফসল ক্ষেতে আগুন লাগাবে না। শত্রপক্ষের সঙ্গে কোনও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হ'লে তার সমস্ত শর্ত মেনে চলবে।"

তাঁর খিলাফত কালে আরবের কয়েকটি গোষ্ঠী যকাত দিতে অস্বীকার করে। তিনি বলেন, "আল্লাহের কসম! যে নমায ও যকাতের মধ্যে ফরাক করে, নিশ্চয়ই আমি তার সঙ্গে জিহাদ করব।" তার পরে যুদ্ধে হারিয়ে তাদের যকাত দিতে বাধ্য করেন। তিনি রসূলে করীমের (সঃ) একজন কুর্‌আন লেখক ছিলেন এবং তাঁর ওফাতের পর তিনিই সর্বপ্রথম কুর্‌আন শরীফ একত্র করেন। তিনি নবুওতের মিথ্যা দাবীদারগণকে যুদ্ধে নিহত বা পরাস্ত করেন। এইরূপে ২ বৎসর ৩ মাস ১০ দিন খিলাফত ক'রে তিনি ১৩ হিঃ সনের ২১ জমাদিয়ুস্‌সানী মাসের সোমবার দিনে (৬৩৪ খ্রীঃ, ২৩শে আগষ্ট) ৬৩ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর শেষ কথা ছিল توفنى مسلما (হে আল্লাহ্‌) আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুগ্রস্ত ক'র।

রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা, ২১/১১/৬২ ইং।

হয্‌রত 'আবদুল কাদির জীলানী (রহঃ)

সায়্যিদুনা মুহ্‌য়ুদ্দীন আবূ মুহম্মদ আবদুল কাদির জীলানী (কুদ্দিসা সির্‌রুহু) ঈরানের উত্তরাংশে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী তবরিস্তান প্রদেশের জীলান শহরের নিকটস্থ নীফ বা নয়ফ গ্রামে ৪৭০ হিজরীর ১লা রমযান তারিখে (১৮ মার্চ, ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হয্‌রত সয়্যিদ আবূ সালিহ মূসা জঙ্গী দোস্ত, হযরত ইমাম হসনের (রাঃ) বংশসম্ভূত এবং মাতা সয়্যিদা উম্মুল্ খয়র আমাতুল্ জব্বার ফাতিমাঃ হয্‌রত ইমাম হুসয়নের (রাঃ) বংশজাত ছিলেন। এজন্য তাঁর পদবী "হসনী ও হুসয়নী" হয়েছে। পাক ভারতের মুসলমান সমাজে তিনি হয্‌রত বড়পীর সাহেবরূপে খ্যাত। তাঁর বিখ্যাত কবিতা কসীদাঃ গওসিয়ায় তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

ওআ ওআল্লানী 'আল্‌ল্ আক্‌তাবি জম্'আন্
ফা হুক্‌মী নাফিযুন্ ফী কুল্লি হালী।
আনা-ল্‌জীলিয়্যু মুহ্‌য়িদ্দীনি ইস্‌মী,
ওআ আ'লামী 'আলা রা'সিল্ জিবালী।
ওআ 'আব্‌দুল্ কাদিরি-ল্ মশ্‌হূরু ইস্‌মী,
ওআ আক্‌দামী 'আলা 'উনুকি-র্ রিজালী।

অর্থাৎ—

দিয়েছে কর্তৃত্ব কুতব সবার উপরে আমার,
সকল দশায় আদেশ আমার হয় বলবান্।
মুহ্‌য়িউদ্দীন জীলানী আমার অতি শুভ নাম,
সকল গিরির চূড়ায় উড্ডীন আমার নিশান।
'আব্দুল কাদির জগদ্‌বিখ্যাত নামটি আমার,
সকল লোকের গ্রীবাদেশে মোর চরণ দু'খান।

তিনি মাতৃগর্ভেই বিলায়ত (ওলীর পদ) লাভ করেন। তিনি শৈশবে রমযান মাসে দিনমানে কখনও মায়ের দুধ খেতেন না। তাঁর স্তন্যপান কালে একবার রমযানের নূতন চাঁদ দেখা সম্বন্ধে মতভেদ হয়। তাঁর মা বলেন যে, ভোর থেকে শিশু তাঁর দুধ খায় নি। সন্ধান ক'রে জানা যায় যে, বাস্তবিক সেই দিন পয়লা রমযান ছিল। তিনি এই বিষয়ে নিজের একটি কবিতায় বলেছেন–

বিদায়তু আম্‌রী যিক্‌রুহূ মলা আ-ল্ ফধা,
ওআ সওমী ফী মহ্‌দী বিহী কানা।

অর্থাৎ — আমার আরম্ভ অবস্থার বৃত্তান্তে চারি দিক্ পূর্ণ,
আর দোলায় আমার রোযা বিখ্যাত।

যখন তিনি দশ বৎসর বয়সে মক্তবে পড়তেন, তখন তিনি শুনতেন, ফিরিশ্তা তাঁকে বলছে, "আস্সালামু 'আলায়কুম ইয়া ওলিয়াল্লাহ্" অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তা'আলার ওলী! তোমার উপর সালাম।

হয্রত বড় পীর সাহেব বলেছেন যে যখন আমি বালক ছিলাম এবং অন্য বালকদের সঙ্গে খেলতে ইচ্ছা করতাম, তখন কে যেন আমাকে বলত, "ইলায়্যা ইয়্যা মুবারক! ইলায়্যা ইয়া মুবারক!" অর্থাৎ হে সৌভাগ্যবান্! আমার দিকে এস। হে সৌভাগ্যবান্। আমার দিকে এস। তখন আমি ভয়ে মায়েব কাছে দৌড়ে যেতাম। কারণ আমি বক্তাকে দেখ্তে পেতাম না। এখনও আমি সেই আওয়াজ শুনতে পাই, কিন্তু তা নির্জন বাসের মধ্যে।

আঠার বৎসর বয়স হ'লে হয্রত বড় পীর সাহেব বিদ্যা শিক্ষার জন্য দারুল খিলাফত বগদাদ শহরে যেতে ইচ্ছা করলেন। তাঁর মা তাঁকে আল্লাহের উপর সোপর্দ ক'রে তাঁকে বিদায় দিলেন। বিদায় কালে তিনি বল্লেন, "আবদুল কাদির! তুমি সদা সত্য কথা বল্বে। কখনও মিথ্যা বলবে না।" তিনি তাঁর জামার নীচে ৪০টি দীনার মুদ্রা সিলাই ক'রে দিলেন। কাফেলা বগ্দাদের পথে রওয়ানা হ'ল। হামাদান শহর থেকে কাফেলা আগে বাড়লে একদল ডাকাত তাদের উপর হামলা করলে। তারা যাত্রীদের মাল আসবাব লুট ক'রে নেয়। তার কাছে যে ৪০টি দীনার সেলাই করা ছিল, তিনি ডাকাতদের সরদারকে তা দেখান। সরদার বলে, "ওহে তুমি দেখছ না যে আমরা ডাকাত। কেন তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেই তুমি অনায়াসে ব'লে ফেল্লে যে তোমার কাছে ৪০টি দীনার লুকানো আছে, আর তা দেখিয়ে দিলে?" তাতে তিনি উত্তর দেন যে, "মায়েব হুকুম সত্য কথা বল্তে। আমি কি ক'রে সে হুকুম অমান্য করি?" তখন সরদার ব'লে উঠল, "আহা! তুমি মায়ের হুকুম পালন করেছ। আর আমরা কি-নরাধম যে খোদার হুকুম অমান্য ক'রে লুটতরাজ করছি।" বড় পীর সাহেব বললেন, "আল্লাহ্, তোমাকে নেক কাজের শক্তি দিন আর নেক পথে চালান।" এই কথা শুনে ডাকাত তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। তারপর তাঁর হাতে তওবা ক'রে তাঁর কাছে মুরীদ হয়। সর্দারের দেখাদেখি অন্য ডাকাতেরাও তওবা ক'রে তাঁর কাছে মুরীদ হয়।

তিনি ৪৮৮ হিঃ সনের সফর মাসে বগ্দাদে এসে নানা ওস্তাদের নিকট নানা ধর্মবিদ্যা শিক্ষা করতে থাকেন। তিনি সেখানকার নিযামিয়া মাদ্রাসায় কুরআন, হদীস, তফ্সীর, ফিক্হ প্রভৃতি ধর্মবিদ্যা (দীনিয়াত) আর তার সাথে সাথে পারসী সাহিত্য ও ব্যাকরণ বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সঙ্গে পড়েন। এই সময়ে তিনি দারুণ অর্থকষ্ট ভোগ ক'রেছিলেন। তার মায়ের দেওয়া ৪০ দীনার তিনি শুধু নিজের খাওয়া-পরায় ব্যয় না ক'রে দান খয়রাত ক'রে শীঘ্রই নিঃশেষ ক'রে ফেলেন। তখন তিনি কখন উপোস ক'রে, কখনও বা গাছের পাতা বা কাঁচা শাকসব্জী খেয়ে জীবন ধারণ করতে থাকেন। তবুও তিনি ভিক্ষা বা কর্জ করতে রাজী হন নি। এই সময় একদিন তিনি

এক অদৃশ্য বাণী শুনতে পান। সেই বাণী যেন তাঁকে কর্জ ক'রে খেয়ে পড়াশুনা করতে বলছে। তিনি বললেন, "আমি এত গরীব, কে ধার দিবে? আর যদিও বা ধার দেয়, আমি কেমন ক'রে ধার শোধ কর্‌ব?" সেই বাণী বল্‌লে, "তুমি কর্জ কর, আমি শোধ করার জিম্মা নিলাম।" তখন তিনি এক রুটিওয়ালার কাছ থেকে ধারে রুটি নিয়ে খেতেন, আর পড়াশোনা করতেন। তিনি শুক্‌নো রুটি খেতেন; কোনও তরকারী তাঁর জুট্‌ত না। এই রকম দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন।

তাঁর ছাত্র জীবনের একটি ঘটনায় তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার তিনি বিশ দিন শাক পাতা ছাড়া আর কোনও খাবার খেতে পান নি। তিনি এমন অবস্থাতেও কারও কাছে কিছু চাওয়া পছন্দ করেন নি। তিনি শহরের বাইরে এক ভগ্ন স্তূপে গিয়ে সন্ধান করতে চাইলেন, যদি কিছু পয়সা কড়ি খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তা দিয়ে কিছু খাবার কিন্‌বেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, ৭০ জন দরবেশ সেখানে পয়সার সন্ধানে ব্যস্ত আছেন। তিনি তাদের কাজে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইলেন না। তিনি শহরে ফিরে এলেন। কিন্তু খোদার মর্‌জি সেখানে এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। সে লোকটি তাঁর মায়ের কাছ থেকে তাঁকে দেবার জন্য কিছু টাকা কড়ি এনেছিল। তিনি টাকা পেয়ে সেই ভগ্ন স্তূপে দৌড়ে গেলেন। একটি মুদ্রা ছাড়া তিনি সমস্তই সেই দরবেশদেরকে খয়রাত ক'রে দিলেন।

আট বৎসর পরে ৪৯৬ হিঃ সনের যিল্‌হিজ্জঃ মাসে তিনি পড়াশোনা সম্পূর্ণ ক'রে সনদ হাসিল করেন। বড় পীর সাহেব আরবী ভাষায় ও ধর্মবিদ্যায় এরূপ অভিজ্ঞ হ'য়ে উঠেন যে, ইব্‌ন নজ্জার তাঁর ইতিহাসে তাঁকে সেই সময়ের ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন। বাহ্য বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিক চর্চায় ও সাধনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি বিখ্যাত সূফী আবুল্‌ খয়র মুহম্মদ হম্মদ আদ্‌ দব্বাসের নিকট তসৌউফ শিক্ষা করেন। ৫০৩ হিজরীতে আদ্‌ দব্বাস ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন যে, "এই 'আজম দেশী কালে সূফীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করবেন এবং তিনি প্রত্যাদিষ্ট হ'য়ে বল্‌বেন, 'আমার চরণ সমস্ত আউলিয়ার ঘাড়ের উপর', তখন তাঁরা তাঁদের ঘাড় তাঁর সম্মানের জন্য নত করবেন।" তারপর তিনি ২৫ বৎসর কাল এবাদত বন্দেগীতে কাটান। এই সময় তিনি হয্‌রত শয়খ আবূ স'ঈদ মুবারক মুখর্‌রিমীর নিকট সূফী মতে দীক্ষিত হন।

তাঁর পীরের নিকট দীক্ষিত হওয়ার বৃত্তান্ত এই রূপে বর্ণনা করা হয়েছে — তিনি ১১ বৎসর কাল একটি টুঙ্গির উপর বাস ক'রেছিলেন। এই টুঙ্গি এই কারণে বুর্জ 'আজমী নামে খ্যাত হয়। তিনি সেখানে থাকা কালে একবার সংকল্প করেন যে, কেউ তাঁকে নিজের হাতে না খাওয়ালে তিনি কিছুই খাবেন না। এই রকম তিনি ৪০ দিন অনাহারে ছিলেন। ৪০ দিন পরে কেউ কিছু খাদ্য তাঁর কাছে এনে দেয়; কিন্তু তিনি তা ছোঁন নি। সেই সময় বিখ্যাত 'আলিম ও পীর হয্‌রত আবু স'ঈদ মুবারক আল্‌ মুখর্‌রিমী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হ'লে হয্‌রত আবূ স'ঈদ স্বহস্তে তাঁকে খাওয়ান এবং ফকীর দীক্ষা চিহ্ন স্বরূপে তাঁকে খির্কাবস্ত্র পরিয়ে দেন। তিনিও স্বয়ং বড়পীর সাহেবের হাত থেকে খির্কা নিয়ে পরেন। তাতে তাঁরা পরস্পর পীর ও মুরীদ হন।

৫২১ হিঃ সনের ১৬ই শওয়ালের বুধবারে তিনি হয্রত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওআ সল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। আঁ হয্রত বললেন, "ইয়া 'আব্দাল্ কাদির! লিমা লা তকল্লম ?" — হে 'আবদুল কাদির! কেন তুমি বক্তৃতা কর না?" তাতে তিনি উত্তর দেন, "হযরত, আমি 'আজমদেশী, আরবাসীদের সামনে কেমন ক'রে মুখ খুলি?" তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কুর্আন মজীদের একটি আয়ত প'ড়ে তাঁর উপর ফুঁক দেন। সে দিন থেকে তিনি ধর্ম বিষয়ে ওয়ায (বক্তৃতা) করতে শুরু করেন। প্রথমে তাঁর সভায় অল্প লোক হাজির হ'ত। তারপর তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন ৭০ হাজার পর্যন্ত লোক তাঁর সভায় জমায়েত হ'ত। বহু 'আলেম ফাযেল, ওলীদরবেশ তাঁর বক্তৃতা শুন্তে উপস্থিত হ'তেন। তিনি ৫৫৫ হিঃ পর্যন্ত ৩৪ বৎসর ওয়ায করেন। তিনি তাঁর কসীদাঃ কবিতায় নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—

দরস্তুল্ 'ইল্মা হত্তা সির্তু কুত্বান,
ওআ নিল্তুস্ সা'দা মিন্ মওলাল্ মওআলী।

অর্থাৎ যত বিদ্যা জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া হইনু কুতব,
প্রভুর দয়ায় সৌভাগ্য লভিয়া হনু লাভবান্।

তাঁর মুহ্য়ুদ্দীন (ধর্মের পুনর্জীবনদাতা) উপাধির বিষয়ে কথিত আছে যে তিনি ৫১১ হিজরী সনে এক সত্য স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন যে বগ্দাদ শহরের কিনারে এক চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ মাটিতে প'ড়ে আছেন ; কিন্তু তাঁর চেহারা থেকে যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। তিনি বড় পীর সাহেবকে দেখে বললেন, "আস্সালামু 'আলায়কা।" বড় পীর সাহেব সালামের জবাব দিলেন। তখন বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন, "তুমি আমাকে তুলে বসিয়ে দাও।" তিনি তাঁকে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে ?" তিনি উত্তর দিলেন, "তুমি আমাকে চিন না! আমি তোমার মহাত্মা দাদার (রসূলুল্লাহের) ধর্ম। আমি দুর্ব্বল হয়ে গিয়ে ছিলাম। এখন তোমার হাতের সাহায্যে আমি উঠলাম এবং তাজা হ'লাম। তুমি মুহয়ুদ্দীন হলে।" সে দিন যখন বড় পীর সাহেব জুমা মসজিদে গেলেন, তখন সেখানে দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন দরবেশদের জমায়েত তাঁকে "মুহ্য়ুদ্দীন" ব'লে সম্বোধন ক'রে তাঁর প্রতি সম্মান প্রকাশ করলেন। সেই থেকে তিনি এই নামে প্রসিদ্ধ হ'ন।

আজমীর শরীফের বিখ্যাত পীর হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশ্তী (রাঃ) বড় পীর সাহেবের বদৌলতে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন। তিনি বড় পীর সাহেবের সঙ্গে জূদী পাহাড়ে মোলাকাত করেন। তারপর তাঁর সঙ্গে জীলানে আসেন। তারপর বগ্দাদে এসে ৫৭ দিন তাঁর খেদমত করেন। ইহার ফলে তিনি কামালাত (আধ্যাত্মিক পূর্ণতা) লাভ করেন। তখন তিনি বড় পীর সাহেবের নিকট 'ইরাকের আধ্যাত্মিক অধিকার (বিলায়ত) প্রার্থনা করেন। তাতে বড় পীর সাহেব বলেন, "ইরাকের বিলায়ত শিহাবুদ্দীন সহ্রাওয়ার্দ্দীকে দেয়া হয়েছে; তোমাকে হিন্দুস্তানের বিলায়ত দান করা হ'ল। তুমি সেখানে যাও।")

৫২১ হিজরীতে (১১২৭ খ্রীঃ) হযরত আবু স'ইদ মুবারক আল মুর্খর্রিমী তাঁর মাদ্রাসাটি বড় সাহেবের হস্তে সমর্পণ করেন। সেই বৎসর তিনি সূফী য়ুসুফ হমাদানীর উপদেশে লোকদের কাছে ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন। প্রথমে অল্প শ্রোতা জুটত। কিন্তু ক্রমে শ্রোতার সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, শেষে তাঁকে বগ্‌দাদের হলব ফটকের ধারে সভার স্থান করতে বাধ্য হ'তে হয়। তাঁর সভায় সত্তর হাজার পর্যন্ত লোক সমাগত হ'ত।

৫২৮ হিজরীতে (১১৩৪ খ্রীঃ) সাধারণের চাঁদায় আল মুখর্রিমীর মাদ্রাসাকে বিস্তৃত করা হয়। বড় পীর সাহেব এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হন। তিনি এ সময় থেকে তাঁর ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত ৩৩ বৎসর কাল এই মাদ্রাসায় শিক্ষা দান করেন। তিনি যেমন মহাবিদ্বান্, সেইরূপ মহাতপস্বী ছিলেন। তার বহু কিরামতের (অলৌকিক কার্যের) বৃত্তান্ত প্রামাণিক পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি ৫২১ হিজরীতে ৫১ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। তাঁর চার স্ত্রীর গর্ভে ২৭ পুত্র ও ২২ কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হয্‌রত শয়খ 'আবদুল ওহ্‌হাব ৫২২ হিজরীতে ভূমিষ্ঠ হন। ৫৪৩ হিজরীতে বড় পীর সাহেব তাঁকে মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানের কার্যে নিযুক্ত করেন। বড় পীর সাহেবের পরলোক গমনের পব তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত (সজ্জাদানশীন) হন।

যখন বড় পীর সাহেবের ৯১ বৎসর বয়স হয়, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে দুনিয়া থেকে বিদায় হ'য়ে পরম প্রিয় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর যাবার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তখন তিনি প্রায়ই কুরআন শরীফের একটি আয়াত পড়তেন, যার মানে হচ্ছে — হে প্রশান্ত চিত্ত, তোমার প্রতিপালক প্রভূর নিকট ফিরে যাও; তিনি সন্তুষ্ট এবং তুমি সন্তুষ্ট। ওফাতের (মৃত্যুর) একদিন পূর্বে তিনি নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ প্রদান করেন ঃ "তুমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সভক্তি ভয় ও আনুগত্য নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য মনে করবে। আল্লাহ্ ছাড়া কাকেও ভয় করবে না, কারও কাছে আশা রাখবে না, কারও উপর ভরসা করবে না। তওহীদ (আল্লাহের একত্ব) ভিন্ন আর কিছুর উপর বিশ্বাস রাখবে না; এতে সকলেই এক মত।"

৫৬১ হিজরীর রবী'উস্ সানী মাসের ৯ই তারিখে (১১৬৭ খ্রীঃ) মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা আয্‌রাঈল তাঁর কাছে এসে এক জ্যোতির্ময় চিঠি দিলেন। তাতে লেখা ছিল— "এই পত্র প্রেমিক হ'তে প্রেমাস্পদের কাছে পৌঁছে। প্রত্যেক জীব মৃত্যু-আস্বাদনকারী।" এশার নমাযের পর তিনি বললেন, "আমি সাহায্য চাই সেই আল্লাহের, যিনি ব্যতীত কোনও মা'বুদ (উপাস্য) নেই, যিনি চিরজীবী, যাঁর মৃত্যু নেই, ভয় নেই। পবিত্র তিনি যিনি বান্দাগণের উপর মৃত্যু আনয়ন করতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাশীল। লা ইলাহা ইল্লাহহু মুহম্মদুর্ রসূলুল্লাহ।" এই বাক্যের সঙ্গে তাঁর পবিত্র রূহ (আত্মা) উর্ধ্ব জগতে মহাপ্রয়াণ করলে। ইন্না — লিল্লাহি .....

(তাঁর একটি ফারসী কবিতায় তাঁর খোদা-প্রেমের জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

বে হিজাবানহ্ দর্‌আ আয্ দরে কাশান-ই-মা,
কি কসে নীস্ত ব-জুয্ দর্‌দ্-ই-তূ দর খান-ই-মা।

ফিত নঃ আন্‌গেয্‌ মশও কাকল-ই-মুশকী মুকশাঈ,
তার্ব-ই-যনজীর ন দারদ দিল্‌-ই-দীওআন-ই-মা।
মুর্গ-ই-বাগ-ই মলকূতেম্‌ দরী দয়র-ই-খরাব্‌,
মী শওদ নূর-ই-তজল্লা-ই-খুদা দানা-ই-মা।
বা আহদ্‌ দর্‌ লহ্‌দ-ই-তঙ্গ ব-গোএম কি দোস্ত,
আশনাঈ তূঈ গয়র-ই-তূ বেগান-ই-মা।
গর্‌ নকীব্‌ আয়দ ও পুর্সদ্‌ কি বোগো রব্ব-ই-তূ কীস্ত,
গোয়ম আঁ কস্‌ কি রবূদ ঈঁ দিল-ই- দীওআন-ই-মা।
শুকর লিল্লাহ্‌ কি ন মুরদেম ও রসীদেম ব-দোস্ত,
আফ্‌রীঁ বাদ বরী হিম্মত-ই-মর্দান-ই-মা।
মুহ্‌য়ি, বর্‌ শম'ই তজল্লা-ই-জমালশ্‌ কী সোখত,
দোস্ত মী গোফ্‌ত যিহে হিম্মদ-ই-মর্দান-ই-মা।

আমি নীচে এর গদ্য অনুবাদি দিচ্ছি—

ভিতরে এস বেপর্দা অবস্থায় আমার কুটীরের দোর দিয়ে,
তোমার বিরহদুঃখ ভিন্ন আমার ঘরে আর কেউ নেই।
আমাকে বিপদে ফেলো না, তোমার বাবরি চুল খুলো না,
আমার পাগল হিয়া তোমার শিকলের দুঃখ সইতে পারে না।
আধ্যাত্মিক বাগিচার পাখী আমি, এই নির্জন প্রদেশে
খোদার বিরাজের জ্যোতিই (নূরে তজল্লী) আমার দানা।
সংকীর্ণ গোরের মধ্যে খোদাকে বলব, হে দোস্ত!
একা তুমিই আমার আপন, আর সব আমার পর।
কবরে যখন মনকির নকীর বলবে, বল তোমার প্রভু কে?
তখন বলব, তিনিই যিনি আমার পাগল দিল্‌খানা চুরি করেছেন।
আল্লাহের শোকর, আমি মরি নাই, দোস্তের কাছে পৌঁছেছি।
ধন্য আমার পুরুষোচিত অধ্যবসায়।
মুহ্‌য়ি, তাঁর সৌন্দর্য্যের তজল্লীর (বিরাজের) দীপ তোমাকে পোড়াচ্ছে।
দোস্ত বল্‌লেন, সাবাশ আমার পুরুষোচিত অধ্যবসায়।

বড় পীর সাহেবের প্রচারিত সূফী মতকে কাদিরিয়া তরীকাঃ বলা হয়। সমস্ত ইসলামী দুনিয়ায় এই তরীকাঃ প্রচলিত আছে। বগ্‌দাদে বড়পীর সাহেবের মাযার একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

হযরত বড়পীর সাহেবের রচিত নয়খানি পুস্তকের নাম Encyclopaedia of Islam নামক প্রসিদ্ধ ইস্‌লামী বিশ্বকোষে উল্লিখিত হয়েছে —

১। আল্‌ গুন্‌য়াঃ লি-তালিবি তরীকিল্‌ হক্ক; সংক্ষেপে গুন্‌য়িতু-ত্‌ তালিবীন।
২। আল্‌ ফত্‌হুর্‌ রব্বানী।

৩। ফুতুহুল গয়ব।

৪। হিয্‌বু ব-শা'ইরিল খয়রাত। মুনাজাতের সমষ্টি।

৫। জবূই-ল্ খাতির। বক্তৃতা সমষ্টি।

৬। আল্ মওআহিবুর্ রহমানিয়াঃ ও আল্ ফুতুহুর্ রব্বানিয়াঃ ফী মরাতিবিল্ আল্লাকিস সনিয়াঃ ও আল্ মকামাতিল ইর্‌ফানিয়া ঃ। সম্ভবত ঃ ২ ও ৩ নম্বর পুস্তকের সমষ্টি।

৭। ইয়ওআকীতুল্ হিক্‌ম।

৮। আল্ ফুয়ুধাতুর্ রব্বানিয়া ঃ ফী-ল আও ওআলিল্ কাদিরিয়াঃ। মুনাজাত সমষ্টি।

৯। তাঁর জীবন চরিত বহ্‌যাতুল্ আস্‌রার পুস্তকে উদ্ধৃত বক্তৃতাবলি।

এইগুলি ব্যতীত একটি আরবী কসীদাঃ কসীদাতুল গওসিয়াঃ এবং ফারসী দীওয়ান তাঁর নামে প্রচারিত আছে।)

প্রথমে ঢাকা রেডিওতে প্রচারিত। ৮/১২/৫৪ প্রথম প্রকাশ মাহেনও, ফাল্গুন ১৩৬১ পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

ইসলাম প্রচারে
হযরত শাহ্ জালাল মুজর্রদের ভূমিকা

ইসলাম প্রচারমূলক ধর্ম। হয্‌রত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর শেষ নবী (বা সংবাদবাহক) এবং রসূল (বা প্রেরিত দূত)। তাঁর প্রতি আল্লাহর আদেশ ছিল —

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ط وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط

[হে (আল্লাহ্‌র) রসূল, তোমার রব্ব (বা প্রতিপালক প্রভু) তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তা (বিশ্ববাসীর নিকট) প্রচার কর; আর যদি তুমি তা না করলে, তবে তুমি তাঁর প্রেরিত বাণী প্রচার করলে না। আর আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন অর্থাৎ এই প্রচার কার্যে কেউ তোমাকে নিরস্ত করতে বা তোমার প্রাণ নাশ করতে পারবে না।' (সূরাঃ মাইদা ঃ আয়াত ৬৭)

মুসলমানদের প্রতিও ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহের আদেশ আছে —

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

[তোমার মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় হওয়া চাই, যারা মঙ্গল অর্থাৎ ইস্‌লামের দিকে (লোকদেরকে) আহ্বান করবে, সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর এরাই হবে সফলকাম।]

(সূরাঃ আল্ 'ইমরান ঃ আয়াত ১০৪)

পরিণামে যে ইস্‌লাম সকল ধর্মের উপর জয়ী হবে, তার ভবিষ্যদ্ বাণী কুর্‌আন পাকে রয়েছে —

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ○

[তিনিই (আল্লাহ্) যিনি রসূলকে পথ প্রদর্শন এবং সত্য ধর্মের সঙ্গে পাঠিয়েছেন যেন সেই ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন।] (সূরাঃ সফ্‌ফ ঃ আয়াত ৯)

এই ধর্ম প্রচারের জন্যই রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁর আসহাব (রাঃ) প্রিয় জন্মভূমি থেকে হিজরত করেছিলেন, উৎপীড়ন অত্যাচার, যুদ্ধ বিগ্রহ সহ্য করেছিলেন, শরীরের রক্ত দান করেছিলেন এবং কেহ কেহ শাহাদত বরণ করেছিলেন। যার ফলে এখন এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের কয়েক কোটি লোক ইস্‌লামের শান্ত-শীতল ছায়ায় বাস করছে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন খ্রীষ্টান মিশনারীরা দলে দলে সেখানে গিয়ে তাদের ধর্ম প্রচার করেছিল। কিন্তু হায়! মুসলমান তাদের আল্লাহ্ ও নবীর আদেশ ভুলে গিয়ে নিশ্চেষ্ট বসেছিল।

এই পাক-ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলে সাহাবাদের (রাঃ) সময় থেকেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল। পূর্ব অঞ্চলে সমুদ্র তীরবর্তী ব'লে ইস্‌লামের আদি যুগেই চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারিত হওয়া বিচিত্র ছিল না; কারণ এই পথ দিয়েই আরব বণিকগণ চীন পর্যন্ত বাণিজ্য-যাত্রা করত। কিন্তু এই পূর্ব পাকিস্তানের বিস্তৃত পূর্ব প্রান্ত বহুদিন ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। যাঁর বদৌলতে এ অঞ্চলে ইস্‌লামের আলো ছড়িয়ে পড়ে, তিনি হচ্ছেন হযরত শাহ্ জালাল মুজর্রদ, যাঁর পাক মাযার সিলেটে বিরাজমান রয়েছে। একটি গ্রাম্য ছড়ায় শাহ্ জালালের উল্লেখ পাই—

হিন্দু আছে লাখে লাখে নাইরে মুসলমান।
সিলেটের কাছে আসি কে দিল আযান ॥

হযরত শাহ্ জালাল সম্বন্ধে প্রাচীনতম বিবরণ ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত "গুল্‌যারে আব্‌রার" নামক ফারসী পুস্তকে পাওয়া যায়। এখানে তার যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ দিচ্ছি।—

"শয়খ জালালুদ্দীন মুজর্রদের স্মৃতি। তিনি তুর্কস্থানী-জাত বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি সুল্‌তান আহমদ ইয়েস্‌ভীর খলীফা ছিলেন। তিনি একদিন তাঁর রওশন-যমীর (উজ্জ্বলহৃদয়) পীরের নিকট আরয করেন যে, যেমন হুযুরের হিদায়তের আলোকে সে শ্রেষ্ঠ জিহাদে (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনায়) কিছু জয়লাভ করেছে, সেইরূপ হুযুরেব সফলতা-প্রদানকারী আশীর্বাদের সাহায্যে ক্ষুদ্র জিহাদেও (অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে) যেন সে মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারে এবং যেখানে যেখানে বিধর্মী রাজ্য আছে, সে সমস্ত স্থান জয় ক'রে সে যেন গাযী বা শহীদের উচ্চপদ পেতে পারে। বুযুর্গ পীর তাঁর মিনতি কবুল করলেন এবং তাঁর প্রধান খলীফাগণের মধ্যে কয়েক শত ভাগ্যবান্ জনকে তাঁর সঙ্গী ক'রে দিলেন (আল্লাহ্ তাঁদেরকে ইয্যত দান করুন)। যেখানেই শত্রুর সঙ্গে তাঁদের মোকাবেলা হ'ত, তাঁরা জয়পতাকা উড়াতেন। আশ্চর্যতর ব্যাপার ছিল যে এই বহুবিস্তৃত লড়াইয়ে লুটের মাল ভিন্ন তাঁদের অন্য কোনও রুযী ছিল না, তবুও তাঁরা বড়মানুষী হালে জীবন যাপন করতেন। কোনও লুটের মাল বা গৃহপালিত জন্তু লাভ হ'লে কোনও এক বুযুর্গকে তা দিয়ে ইসলামের পথ প্রদর্শন ও বিস্তারের ভার তাঁর উপর সোপর্দ করা হ'ত। শেষ কথা, তিনি ৩১৩ জন সহ সূবা বাংলার এলাকায় সিরহতে (শ্রীহট্ট) পৌঁছুলেন। এক লক্ষ পদাতিক এবং কয়েক হাজার ঘোর-সওয়ারের মালিক গৌর গোবিন্দ ঐ স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন। সেই বড় লশকরের তুলনায় এই দল খাবারের মধ্যে নুনের সঙ্গেও তুলনীয় হ'তে পারত না।

যখন যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, তখন অদৃষ্টের পর্দা থেকে "কত না ক্ষুদ্র দল আল্লাহের হুকুমে বড় দলের উপর জয়ী হয়েছে" এই (কুরআনের) বাণীর প্রকাশ জাজ্জ্বল্যমান হ'ল এবং সেই মূর্তিপূজক পলায়নপর হ'য়ে কেবল নিজ প্রাণকে নরকের দিকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু সমর্থ হ'ল না। সমস্ত দেশ ও ভূমি জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের জয়ীদের হাতে পড়ল। শয়খ মুজর্রদ প্রত্যেকের জন্য হিস্‌সা স্থির ক'রে তাঁদের জায়গীর দিলেন এবং প্রত্যেককে বিবাহ্ করবারও অনুমতি দিলেন। এই ভাগাভাগিতে শহরটি শয়খ নুরুল হুদা আবুল কিরামত স'ঈদী হুসয়নীর ভাগে পড়ে। তিনি গৃহী হন এবং সন্তান জন্মদান করেন। তাঁর বংশধর শয়খ 'আলী শের এই বৃত্তান্ত তাঁর নুযহাতুল আর্ওয়াহের টীকার ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন।"

এই বিবরণে জানা গেল যে শাহ্ জালালের প্রকৃত নাম শয়খ জালালুদ্দীন মুজর্রদ এবং তাঁর জন্মস্থান ছিল তুর্কিস্তান। তাঁর সিলহেটে আগমনের কাল আমরা একটি শিলালিপি থেকে পাই। ৯১৮ হিঃ (১৫১২ খ্রীঃ) সালের সুলতান হুসয়ন শাহের আমলের শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে ৭০৩ হিঃ (১৩০৩ খ্রীঃ) সালে সুলতান ফিরোয শাহ্ দেহ্লভীর আমলে মুহম্মদের পুত্র শয়খ জালাল মুজর্রদের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে সিকন্দর খান গাযী কর্তৃক সর্ব প্রথমে শ্রীহট্টে মুসলমান বিজয় হন।[১] এই তারিখের সমর্থন শয়খ জালালের পীর সৈয়্যিদ আহ্মদ ইয়েসভীর কাল থেকে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন তুর্কিস্তানের হযরত খাজা 'আযীযান 'আলী রামীতনির (মৃত্যু ৭১৫ হিঃ, ১৩১৫-১৬ খ্রীঃ) সমকালীন। ৭৪৭ হিঃ (১৩৪৬ খ্রীঃ) সালে বিখ্যাত পর্যটক ইব্‌ন বতূতা কামরূপে যে পীর জালালুদ্দীনের সাক্ষাৎকার করেন এবং যাঁর মৃত্যু পর বৎসরে ১৫০ বৎসর বয়সে হয়েছিল, তিনি এই সিলেটের শাহ্ জালাল থেকে অভিন্ন। এই সময় সিলেট কামরূপের অন্তর্গত ছিল। যা হোক এই হযরত শাহ্ জালাল এবং তাঁর খলীফাগণের প্রচারের ফলেই সিলেট জিলায় এবং পার্শ্ববর্তী ভূভাগে ইসলাম বিস্তৃত হয়। ইব্‌ন বতূতা লিখেছেন, "এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁর হাতে ইস্‌লামে দীক্ষা গ্রহণ করে। এই জন্য তিনি তাদের মধ্যে থেকে যান।"

হযরত শাহ্ জালাল তাঁর শিষ্যগণ সৈয়িদ জা'ফর, সৈয়িদ 'আব্‌দুল গফুর, সৈয়িদ ইব্রাহীম, সৈয়িদ ইসমা'ঈল, সৈয়িদ ইসহাক, সৈয়িদ মৌলভী রওশন 'আলী, সৈয়িদ গোলাম মুর্তযা, শাহ্ জামাল, শাহ্ কামাল, সৈয়িদ শাহ্ আকরম 'আলী এবং শাহ্ আম্বিয়াকে ত্রিপুরা জেলায় ইসলাম প্রচারে পাঠান, এবং মৌলানা হাফিয আহ্মদ, শাহ্ হাফীযুল্লাহ্,শাহ মুহম্মদ দাইম, শাহ্ ওলীয়ুল্লাহ্, শাহ্ রওশন 'আলী, শাহ্ আহ্মদুল্লাহ প্রভৃতিকে তবলীগের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন। তিনি নানা শাহ্, হারুন শাহ্, 'ইনায়াত কমরবস্তা, মহবুব শাহ্, মিয়া সাহিব বোগদাদী, সৈয়িদ আহ্মদ ওরফে 'কল্লা শহীদ' প্রভৃতিকে নোয়াখালী জেলায় পাঠান। কাছাড়, রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হয্রত শাহ্ জালালের খলীফাগণ ইসলাম প্রচার করেন। কথিত আছে যে, জেলা ২৪ পরগণার পীর সৈয়িদ 'আব্বাস ওরফে গোরাচাঁদ

১। J R A. S. B. ১৯২২, পৃঃ, ৪১৩।

তাঁর খলীফা ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে সুন্দরবন অঞ্চলে ইস্‌লাম প্রচার করতে গিয়ে শহীদ হন। তাঁর মাযার জেলা ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে আছে। সেখানে প্রতি বৎসর ১২ই ফাল্গুন তাঁর ওরস্ উপলক্ষে মেলা হয়। এই অধম লেখক পীর গোড়াচাঁদের বংশানুক্রমিক লাখেরাযভোগী খাদমানের একজন। হযরত সৈয়িদ 'আব্বাসের নাম হযরত শাহ্ জালালের খলীফাগণের তালিকায় পাওয়া যায়।

ইব্‌ন বতূতা শয়খ জলালুদ্দীন সম্বন্ধে বলেছেন, "তিনি প্রধান পীরগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন"এবং তাঁরই মোলাকাতের জন্য ইব্‌ন বতূতা সদ্‌কাওন (চট্টগ্রাম) হ'য়ে কামরূ (কামরূপ) গিয়েছিলেন। অতএব তাঁর সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, এখানে তার সংশোধনের জন্যে দু'এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সিলেটের তৎকালীন মুনসিফ কুমিল্লা জেলাবাসী নাসিরুদ্দীন হায়দার ১৮৬০ ইং সালে ফারসী ভাষায় "সুহয়ল-ই-য়মন" নামক পুস্তকে শাহ্ জালালের কিংবদন্তীমূলক বিবরণ লেখেন। তাতে শাহ্ জালালের জন্মস্থান য়মন এবং পিতার নাম মাহ্‌মূদ লেখা হয়েছে। এতে আছে যে, তিনি ৫৬১ হিঃ (১১৬৬ খ্রীঃ) সালে সিলেটে আসেন এবং ৫৯১ হিঃ (১১৯৬ খ্রীঃ) সালে এন্তেকাল করেন। ৯১১ হিঃ সালের সুলতান হুসয়ন শাহের শিলালিপিতে শাহ্ জালালকে কুনিয়ায়ী বলা হয়েছে এবং পূর্বোল্লিখিত ৯১৮ হিঃ সালের শিলালিপিতে তাঁর পিতার নাম দেওয়া হয়েছে মুহম্মদ। আমরা দেখেছি যে 'গুলযারে আব্‌রারে' তাঁকে তুর্কিস্তানী জাত বলা হয়েছে। আমার মনে হয় তিনি এশিয়াটিক তুর্কির বিখ্যাত নগর কুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন; এজন্য তাঁকে যেমন তুর্কিস্তানী বলা যেতে পারে, সেইরূপ কুনিয়ায়ীও বলা যেতে পারে। সৈয়িদ জালাল সুর্খ বুখারীর জন্ম ৫৯৫ হিঃ সালে অথচ শাহ্ জালালের মৃত্যু বলা হয়েছে ৫৯১ হিঃ সালে। তা হ'লে দাঁড়াল যে নানার জন্মের আগেই নাতির মৃত্যু হয়েছে। কাজেই সুহয়ল-ই-য়মনীর সমস্ত বিবরণ নির্ভরযোগ্য নয়। ইব্‌ন বতূতার ভ্রমণ বৃত্তান্তে শয়খ জালালুদ্দীনকে কোনও স্থানে তবরিযী এবং কোনও স্থানে শিরাজী বলা হয়েছে। এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, তুর্কিস্তানী বা কুনিয়ায়ী স্থানে স্মৃতিচ্যুতির কারণে এইরূপ লেখা হয়েছে। বস্তুতঃ সিলেটের শাহ্ জালাল শাহ্ জালাল তবরিযী থেকে পৃথক্ ব্যক্তি।

পীরের খাদিমগণ তাঁকে য়মনী (য়মন দেশীয়) বলেন এবং মনে করেন যে তিনি বিখ্যাত পীর জালালুদ্দীন তব্‌রিযী হ'তে ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁদের সম্বল কিংবদন্তীমূলক "সুহয়ল-ই-য়মন" পুস্তক।[২] ডক্টর ওয়াইজ "সুহয়ল-ই-য়মন"-এর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন যে এই বৃত্তান্তের সাল তারিখে গোলাযোগ আছে। নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মৃত্যু হয় ৭২৫ হিজরীতে, অথচ শাহ্ জালাল, যাঁর মৃত্যু ৫৯১ হিজরীতে বলা হয়েছে, নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন ব'লে এতে বর্ণিত হয়েছে।

ডক্টর ওয়াই যে 'সুহয়ল-ই-য়মনের" বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাতে অধিকন্তু আছে যে শাহ্ জালাল ৬২ বৎসর বয়সে "কলিচান্দের" ২০শে তারিখে ৫৯১ হিঃ

২। Dr. J. Wise সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ৪২ সংখ্যক পত্রিকায় ২৭৮ হইতে ২৮১ পৃঃ, ১৮৭৩ ইং সাল।

সালে সিলহেটে দেহ ত্যাগ করেন।[৩] ডক্টর ওয়াইজ "যিল্‌কদ" মাসকে "কলিচন্দ" পড়েছেন এবং শাহ্ জালালের পিতার নাম মুহম্মদ পড়েছেন। আমরা দেখাব যে "সুহয়ল-ই-য়মনের" বৃত্তান্ত সত্যাসত্য মিশ্রিত জনপ্রবাদ মাত্র, তার উপর কোনও ঐতিহাসিক নির্ভর করতে পারেন না।

প্রথম কথা শাহ্ জালাল যে য়মনী ছিলেন, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। হুসয়ন শাহের সময়ে ৯১১ হিঃ সালের সিলহেটের প্রস্তর লিপিতে তাঁকে "শয়খ জালাল মুজর্রদ কুনিয়ায়ী" كنيايى বলা হয়েছে। এতে বোধ হয় যে তিনি আদিতে কুনিয়া নিবাসী ছিলেন। য়মনে কুনিয়া (বা কিন্‌য়া) শহরের অস্তিত্ব এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই।

পূর্বোল্লিখিত হুসয়ন শাহের আমলের প্রস্তর লিপিতে পাওয়া যায় যে ৭৩০ হিঃ সালে সুলতান ফিরোয শাহ দেহ্‌লভীর আমলে মুহম্মদের পুত্র শয়খ জলাল মুজর্রদের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে সিকন্দর খান গাযী কর্তৃক সর্ব্বপ্রথম মুসলমান বিজয় হয়। অতএব ৫৬১ হিঃ সালে সিলহেট বিজয় এবং তৎপরে শাহ্ জালালের তথায় আগমন অসম্ভব। বস্তুতঃ শাহ্ জালালের যে মৃত্যুসন (৫৯১ হিঃ = ১১৯৬ ইং) দেওয়া হয়েছে, তখন বাংলাদেশে মুসলিম অভিযানই হয় নাই।

ডক্টর ওয়াইজের বর্ণনানুসারে "সুহয়ল-ই-য়মনের" মতে শাহ্ জালালের পিতার নাম মুহম্মদ; কিন্তু সম্প্রতি পরলোকগত মুফ্‌তী আযহারুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের মতে "সুহয়ল-ই-য়মনে" তাঁর পিতার নাম মাহমূদ (মুহম্মদ নহে)। কিন্তু পূর্বোক্ত ৯১৮ হিজরীর প্রস্তর লিপিতে তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ লেখা হয়েছে। যা হ'ক "সুহয়ল-ই-য়মন" যে একটি অবিশ্বাস্য কিংবদন্তীমূলক পুস্তক, তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। মুফ্‌তী আয্‌হারুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

ইব্‌ন বতুতা ৭৪৭ হিজরীতে (১৩৪৬-৪৭ খ্রীঃ) কামরূপে পীর জালালুদ্দীনের দর্শন লাভ করেন। বলা বাহুল্য সেকালে সিল্‌হেট কামরূপের অন্তর্গত ছিল। ইহা পূর্বোল্লিখিত মুফ্‌তী সাহেব স্বীকার করেছেন।[৪]

যাঁরা সিলহেটের শাহ্ জলালকে ইব্‌ন বতূতার শয়খ জালালুদ্দীন হ'তে পৃথক্ মনে করেন, তাঁদের যুক্তি এই যে, সিলহেটের শাহ্ জালাল ৭৪০ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। কিন্তু ইব্‌ন বতূতার শয়খ জালালুদ্দীন ৭৪৮ হিজরীতে (১৩৪৮–৪৯ খ্রীঃ) দেহত্যাগ করেন। আরও বলা হ'ল যে খযীনতুল্ আস্‌ফিয়ার মতে জালালুদ্দীন তব্‌রিযীর ওফাত ৬৪২ হিজরীতে (১২৪৪ খ্রীঃ অব্দে) হয়।

এক মতে জালালুদ্দীন তব্‌রিযীর মৃত্যুর তারিখ নিম্নলিখিত বাক্যে পাওয়া যায়—

جلال الدين حلال الله جلال عار فان بود –

এতে আব্‌জদের হিসাবে ৭৩৮ হিজরী হয়।[৫]

---

৩ মুফতী আয্‌হারুদ্দীন আহমদ প্রণীত History of Shah Jalal দ্রষ্টব্য। ৪ শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, পৃঃ ৩৯। ৫. Stapleton, Memoirs of Gaur and Pandua p p 99, 100

১০৮৪ হিজরীর চাঁদ খাঁর লিপি — যা জালালুদ্দীন তব্‌রিযীর গৌড় স্থিত আস্তানার উপর লিখিত আছে, — তাতে তাঁর মৃত্যুর তারিখ আছে

سا کں اوح جـسـت والا -

এতে ৬৩২ হিজরী হয়।

“তয্‌কিরহ্‌-ই-আউলিয়া-ই-হিন্দ ও পাকিস্তান” তাঁর মৃত্যু সন ৬২২ হিজরী বা (১২২৫ খ্রষ্টাব্দ) ব'লে লিখেছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর পূর্ব্ব পাকিস্তানে ইসলাম (পৃঃ ৩৪) গ্রন্থে এই তারিখ গ্রহণ করেছেন।

মুফ্‌তী আয্‌হারুদ্দীন আহমদ বলেন যে সিলহেটের শাহ্‌ জালালের মৃত্যু সন

ساه جلال مـجـرد فـطـب بـود -

এতে ৭৪০ হিঃ পাওয়া যায়। তথাকথিত শাহ্‌ জালাল য়মনীর সহিত এর কোনও সংস্রব নাই। জালালুদ্দীন মুজর্‌রদের মৃত্যুর তারিখ ইব্‌ন বতূতা ব্যতীত সকলেই কেবল শোনা কথার উপর বিশ্বাস করে লিখেছেন। জালালুদ্দীন তব্‌রিযীকে সিলহটের শাহ জালাল মনে করা ভুল। তবে একথা নিশ্চিত যে ইব্‌ন বতূতা সিলহটের শাহ জালালের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর এন্তেকাল ৭৪৮ হিঃ (১৩৪৮-৪৯ খ্রী) অব্দে হয়।

আমরা হযবত শয়খ জালালুদ্দীন মুজর্‌রদের রূহের মগফিরাত ও তরক্কী কামনা করি, যাঁর বদৌলতে পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে।

১৫ ৪-৬২ তাবিখে বেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে প্রচারিত এবং মাহেনও ॥ জুলাই, ১৯৬২ ॥

হয্‌রত নূরুদ্দীন নূরুল হক নূর কুত্‌বুল 'আলম (রহঃ)

রাষ্ট্রীয় পাকিস্তানেব পূর্বে যে সমস্ত পুণ্যাত্মা দরবেশ বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হয্‌রত নূরুদ্দীন নূরুল হক কুতবুল 'আলম ছিলেন পাক-ভাবতের আউলিয়া জমা'অতের একজন শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষ। তিনি বাংলাদেশেব সে কালের রাজধানী পাণ্ডুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার ইলিযাস শাহী সুলতানদের সঙ্গে তাঁর বংশের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন এক বড় দরবেশ। তাঁর নাম হয্‌রত শয়খ 'আলাউদ্দীন 'আলাউল্ হক। তিনি আরবের হাশিমী বংশীয় এবং প্রসিদ্ধ সাহাবী মহাবীর খালিদ বিন ওলীদের বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন লাহোরনিবাসী মৌলানা 'উমর ইব্‌ন আস্'আদ। হয্‌রত শয়খ 'আলাউল হকের পীর ছিলেন গৌড়নিবাসী হয্‌রত শয়খ সিরাজুদ্দীন 'উসমান ওরফে 'আখী সিরাজুদ্দীন। তাঁর পীর ছিলেন দিল্লীর বিখ্যাত হযবত নিযামুদ্দীন আউলিয়া।

শয়খ 'আলাউদ্দীন প্রথম জীবনে যেমন বিদ্বান, তেমনি ধনগর্বিত ছিলেন। তিনি 'গঞ্জে নবাত' (মিষ্টান্ন ভাণ্ডার) উপাধি নিয়েছিলেন। তখন দিল্লীতে ছিলেন বিখ্যাত পীব হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া। তার পীর ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ খাজাঃ ফরীদুদ্দীন, তাঁর উপাধি ছিল 'গঞ্জে শক্কর' (চিনির ভাণ্ডার)। হয্‌রত নিজামুদ্দীন আউলিয়া যখন শুনলেন যে বাংলাদেশের এক ব্যক্তি অহঙ্কার বশে তাঁর পীরের উপর টেক্কা দিয়ে 'গঞ্জে নবাত' উপাধি নিয়েছে, তখন তিনি তাঁর হিদায়তের জন্য নিজের খলীফা শয়খ সিরাজুদ্দীনকে গৌড়ে পাঠিয়ে দেন।

হযর্‌ত নূরুল হকের পিতা হয্‌রত 'আলাউল হক ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতা মৌলানা 'উমর ইব্‌ন আস'আদ গৌরের সুলতান সিকান্দর শাহের খাজাঞ্চী ছিলেন। হয্‌রত নূর কুত্‌বে আলমের ভাই আ'যম খান সুল্‌তান গিয়াসুদ্দীন আ'যম শাহের উযীর ছিলেন। 'আলাউল্ হক পীরের নিকট মুরীদ (দীক্ষিত) হয়ে ফকিরী অবলম্বন করেন। তিনি এরূপ পীরভক্ত ছিলেন যে, পীরের সফরের সময়ে তিনি তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর খাবারের গরম দেগ্‌চি মাথায় ক'রে রাখতেন। এতে তাঁর মাথা একেবারে নেড়া হ'য়ে যায়। আবার তিনি এরূপ দাতা ছিলেন যে, তাঁর মুসাফিরখানায় অগণিত ফকীর দরবেশ খানা পেত। বাদ্‌শাহ মনে করলেন যে, তাঁর খাজাঞ্চী ছেলেকে সরকারী তহবিল থেকে টাকাকড়ি বে-আইনীভাবে দিচ্ছেন। তাই তিনি

'আলাউল্ হককে সোনারগাঁওয়ে নির্বাসিত করেন। সেখানেও তিনি আগের চেয়ে বেশী ক'রে দান খয়রাত করতে থাকেন। তিনি সোনার গাঁওয়ে দু'বছর ছিলেন। তাঁর বহু শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন বিখ্যাত পীর সৈয়িদ আশ্‌রফ জহাঁগীরী সিম্‌নানী। তিনি ৮০০ হিজরী সনে লোকান্তর গমন করেন। তাঁর মাযার পাণ্ডুয়ায়।

এইরূপ পিতার পুত্র ছিলেন হযবত নূরুদ্দীন নূরুল হক। তিনি পিতার নিকটই দরবেশী মতে মুরীদ হন। পরে সিদ্ধিলাভ করে কুত্‌বুল্ 'আলম বা জগতের ধ্রুবতারা উপাধি পান। বাদ্‌শাহ্ গিয়াসুদ্দীন আ'যম শাহ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁদের ওস্তাদ ছিলেন বিখ্যাত পীর হয্‌রত শয়খ্ হামীদুদ্দীন নাগোরী। হযর্‌ত নূরুল হক পিতার খানকায় থেকে ফকীর দরবেশদের খিদমত করতেন। একবার যখন এক পীড়িত দরবেশকে তিনি পায়খানায় নিয়ে যেতেছিলেন, তখন হঠাৎ দরবেশের বাহ্যের বেগ হওয়ায় সে তাঁর জামা কাপড় অপবিত্র করে দেয়। কিন্তু তাতে তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হন নি। তাঁর পিতা তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দোয়া করেন। তিনি পিতার আদেশে ৮ বৎসর কাল খানকায় লাকড়ি বয়ে আনতেন। তাঁর বড় ভাই আ'যম খান যিনি বাদশাহের উযীর ছিলেন, তাঁকে পিঠে ক'রে কাঠ বইতে দেখে বলেন যে, "নূরুদ্দীন, কতদিন তুমি লাকড়ি বইবে? বাপের কাছে থেকে তো দেখলে, তিনি তোমাকে লাকড়ি বওয়াচ্ছেন। তুমি আমার কাছে এস; আরামে থাকবে।" তাতে তিনি উত্তর দেন, "ভাই, আমার কাছে খান্‌কার লাকড়ি বওয়া আপনার উযীরীর চেয়ে ভাল।"

তাঁর পিতা একবার তাঁকে বলেন যে, যেখানে মেয়েলোক পানি তোলে, সেখানে বড় পিছল, সেজন্য অনেকে প'ড়ে যায় এবং কলসী ভেঙ্গে যায়। তুমি তাদের ভরা কলসী ঘাড়ে ক'রে শুকনা জায়গায় এনে দিবে। পিতার আদেশ মত তিনি চার বৎসর কাল মেয়েদের কলসী বইতেন। এজন্য অনেকে তাঁকে হাসি ঠাট্টা করতেও ছাড়ত না। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

পিতার ওফাতের পর তিনি তাঁর খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হন। তাঁর আধ্যাত্মিক খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বিদেশী শিষ্যগণের মধ্যে শয়খ্ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী বিখ্যাত। শয়খ্ হুসামুদ্দীনের শিষ্যগণের সংগৃহীত "রফীকুল্ 'আরিফীন" পুস্তকে পীর কুত্‌বুল্ 'আলম সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। তাতে দেখা যায় যে হুসামুদ্দীন যখন পীরের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে যাত্রা করেন, তখন প্রত্যেক আড্ডায় তিনি স্বপ্ন দেখতেন যেন পীর তাঁকে বলছেন, "আমি তোমার বরাবর আছি। কোনও ভয় নেই।" যখন তিনি নৌকায় চড়েন, তখন এক দরবেশও তাঁর সঙ্গী হন। তিনি তীরে উঠ্‌লে সেই দরবেশ পানিতে প'ড়ে যান, তাঁর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। পাণ্ডুয়ায় পীরের খানকায় এসে তিনি আশ্চর্য হলেন যে, সেই দরবেশ ও পীরের আকৃতিতে কোনও তফাৎ নেই।

শিষ্যগণ শয়খ হুসামুদ্দীনের অনেক উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করছি। (১) দরবেশকে চারটি জিনিস রাখা চাই — দুইটি পূরা, দুইটি ভাঙ্গা। দীন (ধর্ম) ও ইয়াকীন্ (বিশ্বাস) পূরা আর পা ও মন ভাঙ্গা। (২) লোভ হ'চ্ছে

পীড়া, যাঞ্চা মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং না-পাওয়া মৃত্যু। (৩) সংসার ছায়ার ন্যায় এবং পরলোক সূর্যের ন্যায়। কেউ ছায়াকে দৌড়ে ধরতে পারে না, কিন্তু সূর্যের দিকে গেলে ছায়া তার সঙ্গে সঙ্গে চলে"। কুরআন তেলাওত সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি "রফীকুল্ 'আরিফীনে" এইরূপে লিপিবদ্ধ আছে :- "আমি প্রথম অবস্থায় প্রত্যহ ১৫ সেপারা কুরআন শরীফ পড়তাম। এর কিছুদিন পরে ভোরে তেলাওত শুরু করে চ শ্‌তের নমাযের সময় (প্রায় দিন এক প্রহরে) খতম করতাম। তফ্‌সীর মদারিক নিকটে থাক্‌ত; যদি দরকার হত, তফ্‌সীর দেখতাম, তাতে বড় আনন্দ পেতাম। যদি কেই কুত্‌বের পদও পায়, যেন কুরআন তেলাওত না ছাড়ে, অন্ততঃ রোজ এক সেপারা যেন পড়ে।" এ সমস্ত থেকে বেশ বোঝা যায় যে, শয়খ হুসামুদ্দীন কেমন কামিল পীরের কামিল মুরীদ ছিলেন।

আখ্‌বারুল আখিয়ার পুস্তক থেকে হয্‌রত কুত্‌বুল্ 'আলমের কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি। "(১) সেকালের পীরগণ আল্লাহ্‌তা'আলার নামে সংখ্যানুসারে ৯৯ মন্‌যিলের নির্দেশ করেছেন, যাতে সলূক (আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা) সম্পন্ন হয়। কিন্তু আমাদের পীরগণ ১৫টি মন্‌যিলের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তার মধ্যে তিনটি অবলম্বন করেছি। — (ক) মহাবিচারের পূর্বে নিজের বিচার কর, (খ) যে একদিন শৈথিল্য করে, সে ক্ষতিগ্রস্ত, (গ) ফকীরের উপাসনা কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করা। (২) কঠোর তপস্যা (রিয়াযত) এই যে — যখনই তুমি নিজের মনের ভিতর সন্ধান করবে, কি নিদ্রায়, কি জাগরণে, সকল অবস্থায় তাকে খোদার কর্তব্য পালনে রত পাবে। যেমন কোন শিশু যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা ক'রে ঘুমায়, ঘুম থেকে উঠে আবার তাই চায়। (৩) আমার বিদায় কালে আমার পীর উপদেশ দেন যে, সূর্যের মত দাতা হবে, পানির মত বিনয়ী হবে, মাটির মত ধৈর্যশীল হবে এবং সকলের অত্যাচার সহ্য করবে।"

তিনি শিষ্য ও বন্ধুগণের কাছে যে সকল পত্র লিখেছিলেন, সে সকল তাঁর মক্‌তুবাত বা পত্রাবলীতে সংগৃহীত ছিল। আখ্‌বারুল আখিয়ারে মৌলানা 'আবদুল্ হক মুহাদ্দিস দিহ্‌লভী তাঁর মক্‌তুবাতেরে উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং তার কিছু উদ্ধৃত করেছেন। সম্প্রতি তাঁর কয়েকটি পত্র বিহারে সংগৃহীত হয়েছে। আমরা এতক্ষণ পীর কুত্‌বুল্ 'আলমের কেবল এক আধ্যাত্মিক দিক্ সম্বন্ধে কিছু বলেছি। কিন্তু তিনি আদর্শ মুসলমানের ন্যায় দেশ ও জাতির সেবায় যে কঠোর জিহাদ করেছিলেন, তা বলা হয় নি। সংক্ষেপে এখন তা বলছি।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাজী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ গোটা বাংলা দেশে এক স্বাধীন সুল্‌তানত স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ হয্‌রত কুত্‌বুল 'আলমের পিতামহ আস্'আদ লাহোরী তাঁর সঙ্গে বা সমকারে বাংলা দেশে এসেছিলেন; তিনি ইলিয়াস শাহের পুত্র সুলতান সিকান্দর শাহের খাজাঞ্চী এবং সিকান্দর শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দিন আ'যম শাহ্ হয্‌রত কুত্‌বুল 'আলমের সহপাঠী ছিলেন, এ সকল কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সুতরাং ইলিয়াস শাহী রাজবংশের সঙ্গে হয্‌রত কুত্‌বুল্ 'আলমের বংশগত সম্পর্ক ছিল। যখন হিন্দু জমিদার গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশকে রাজ্যচ্যুত

ক'রে স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন, তখন হয্‌রত কুত্‌বুল্ 'আলম স্থির থাকতে পারেন নি। তারপর যখন গণেশ পীর বদ্‌রুল ইসলামকে শহীদ করেন এবং অন্যান্য ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করেন, তখন হয্‌রত কুত্‌বুল্ 'আলম অধীর হ'য়ে জৌনপুরের সুল্‌তান ইব্রাহীমকে রাজা গণেশের শাস্তির জন্য আহ্বান করেন। যখন সুলতান ইব্রাহীম তাঁর কথামত বাংলাদেশ অবরোধ করেন, তখন রাজা গণেশ পীর কুত্‌বুল্ 'আলমের শরণাপন্ন হ'য়ে সুলতান ইব্রাহীমকে বাংলা ছেড়ে যেতে বলতে অনুরোধ করেন। তখন পীর সাহেব বলেন যে, যদি গণেশ ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তবেই তিনি সুলতান ইব্রাহীমকে এরূপ অনুরোধ করতে পারেন। গণেশ তাঁর স্ত্রীর অসম্মতির জন্য মুসলমান হ'লেন না; কিন্তু নিজের বার বৎসর বয়স্ক পুত্র যদুকে ইসলামে দীক্ষিত করাতে রাজী হলেন। হযরত কুত্‌বুল 'আলম তাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ক'রে জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম দিলেন এবং শাহী তখতে বসিয়ে দিলেন। তারপর তিনি সুলতান ইব্রাহীমকে বাংলা থেকে স্বদেশে চ'লে যেতে বল্লেন।

সুলতান ইব্রাহীম সসৈন্যে চলে গেলে পর, গণেশ ছেলেকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে পুনরায় নিজে রাজা হলেন এবং তাকে শুদ্ধি ক'রে হিন্দু ক'রে নিলেন। এই সময় হযরত কুত্‌বুল্ 'আলমের ইন্তেকাল হয়। রাজা গণেশ তাঁর পুত্র শয়খ আনওআর ও পৌত্র শয়খ যাহিদকে পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগাঁওয়ে নির্বাসিত করেন। রাজার আদেশে শয়খ আন্‌ওয়ার শহীদ হন। কিন্তু সেই দিনই রাজা ভবলীলা সাঙ্গ করেন। তখন পুনরায় জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ প্রকাশ্যে মুসলমান হ'য়ে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন এবং শয়খ যাহিদকে সোনারগাঁও থেকে ডেকে আনেন এবং তাঁর কাছে মুরীদ হন।

হয্‌রত নূরুদ্দীন নূরুল্ হক নূর কুত্‌বুল্ 'আলমের মৃত্যুর সন نور بنور شد (নূর নূরের সঙ্গে মিলে গেল)। এতে ৮১৮ হিঃ বা ১৪১৫–১৬ খ্রীষ্টাব্দ হয়। পাণ্ডুয়ায় তাঁর মাযার এখনও বর্তমান আছে। মাযারের খাদিমগণ ৬০০০ বিঘা পীরোত্তর সম্পত্তি ভোগ করেন। তাঁদের কাছে যে প্রস্তর লিপি আছে বা ছিল তাতে পীরের ওফাতের তারিখ ৮১৮ হিঃ ৭ই যিলকদ (১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী)। ব্লকম্যান তাঁর মৃত্যুসন شمس الهدايت (শামসুল্ হিদায়ত) ব'লে উল্লেখ করেছেন। এতে হয় হিঃ ৮৫১ বা খ্রীষ্টাব্দ ১৪৪৭ সাল।* ঐতিহাসিকগণের নিকট এই তারিখই সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য। পীর সাহেবের রফ'অতুদ্দীন নামে আর এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়ায় হয্‌রত কুত্‌বুল্ 'আলমের মাযারে 'উরসের সময় এখন বহু ভক্তের সমাগম হয়।

সম্প্রতি আমরা হয্‌র্‌ত নূর কুত্‌বে আলমের রচিত একটি কবিতা। এটি মুর্শিদাবাদের স্বর্গীয় দেওয়ান খোন্দকার ফয্‌লে রাব্বী সাহেবের সংগৃহীত পুস্তাকাগারে

মিবাতুল আস্‌রার মতে জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ (মৃত্যু ৮৩৬/ খ্রী ১৪৩২) এবং তাঁর উত্তরাধিকারী পত্র শাসসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহ (রাজত্ব ১৪৩২—১৪৩৫ খ্রীঃ) উভয়ে হয্‌রত কুত্‌বুল্ আলমের মুরীদ ছিলেন।

একটি হস্তলিখিত পুস্তকে আছে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র জনাব খোন্দকার 'আলী আফযল সাহেবের সৌজন্যে সেটি মর্নিং নিউজ পত্রিকায় ১৪ই মার্চ, ১৯৬৫ সালে ফটোসহ মুদ্রিত হয়েছে। কবিতাটির প্রত্যেক চরণের প্রথম অর্ধেক ফার্সী ও অপর অর্ধেক মধ্য যুগের বাংলায় ফার্সী অক্ষরে লেখা। আমীর খুসরও এইরূপ ফার্সী ও হিন্দী মিশ্রিত কবিতা তাঁর পূর্বে রচনা করেছিলেন। বোধ হয় তাঁরই অনুসরণে হযরত নূর কুত্‌বে 'আলম এইরূপ মিশ্রিত কবিতা (রেখ্‌তহ্‌) রচনা করেন। কবিতাটি এই — (বন্ধনী মধ্যে পাণ্ডুলিপির ভ্রান্ত পাঠ)

১। ওহ্‌ চেঃ কর্দম্‌ রূএ তু দীদম
উমত পাগল ভৈলুঁ (ফৈঁলুঁ)।

২। হমচূঁ মজ্‌নূঁ বহ্‌রে লয়্‌লা
ভাবত বেকল ভৈলুঁ (হৈলুঁ)॥

৩। মূএ কুশাদী জানম্‌ বুর্দী
বলিয়া পিটালি মোরে।

৪। শব্‌ ন খুফ্‌তম রোয না খোর্দম্‌
কতেক পোড়সি মোরে॥

৫। জানম্‌ বুর্দী আযমন জানাঁ।
মুঞি তোর দোষ না কৈলুঁ।

৬। দর্দে ফিরাকত্‌ হর্‌ শব্‌ গিরিয়ম্‌,
তাহার সুফল পাইলুঁ॥

৭। গর্‌তু বিয়াঈ যিন্দাঃ শওম
মইঁ শিশ ধরুঁ তোর পাএ।

৮। ময়ল্‌ মুহব্বত্‌ আয্‌ সর্‌ (তু)জোওম
তুঝেঁ জানো তার (তোর) নাঞি (নাঈ)॥

৯। গর্‌ তোরা (তু) বুগুযারম্‌ খলক্‌ চেঃ গোয়ন্দ
নেহা কেহ্নে (চেঃ) তো সনে কৈলুঁ।

১০। মা যাঁ (ঈঁ) দর্দত্‌ পা কুশায়েম্‌,
এহাত (এয়ালত্‌) কেনে না (তাঁ) মৈলুঁ ॥

১১। দীদম্‌ রূএ তু গশ্‌তম্‌ 'আশিক,
চুনাঁ শুদ শুহরত (শহর) বশহ্‌রে চুনী মজ্‌নূঁ লায়লা।

১২। তাকতে সব্‌র ন মানদ্‌ কুত্‌ব
কতেক দূখ সহেলুঁ ॥

১৩। দর্‌ হর্‌ মূএ সোয দারম্‌
অনেক (ওনেক) পুড়ি মরুঁ॥

অনুবাদ –

১। বাঃ। কি করলাম? মুখ তোমার দেখলাম, উন্মত্ত পাগল হলাম।

২। যেমন মজ্‌নুঁ লায়লার জন্য ভাবে বিকল হলাম।

৩। চুল এলায়েছ, পরাণ কেড়েছ, সবলে পিটিয়েছ মোরে।

৪। রাতে ঘুমাই নাই, দিনে খাই নাই, কত পোড়াস মোরে।

৫। পরাণ আমার কেড়েছ আমা হতে, হে প্রিয়! আমি তোমার কাছে দোষ করি নি।

৬। তোমার বিরহবেদনায় প্রতি রাত্রি কাঁদি, তার সুফল পেলাম।

৭। যদি তুমি এস, জীবন্ত হব, আমি মাথা রাখি তোমার পায়।

৮। অনুরাগ প্রেম মাথা দিয়ে চাই, তোমাতে তার জ্ঞান নাই।

৯। যদি তোমাকে আমি ছাড়ি, লোকে কি বলবে? কেন প্রেম তোমার সঙ্গে করলাম?

১০। আমি তোমার এই বেদনার জন্য পা ফিরাই, এর থেকে কেন না মরলাম।

১১। তোমার মুখ দেখলাম, প্রেমিক হলাম, এরূপ হ'ল খ্যাতি নগরে যেরূপ মজনুঁ ও লায়লা।

১২। কুতবের ধৈর্য্যের শক্তি নাই, কত দুঃখ সইলাম।

১৩। প্রতি লোমে আমি জ্বালা পাই, অনেক পুড়ে মরি।

এমনি ছিলেন হয্‌রত নূর কুত্‌বে 'আলম (রহঃ) সূফী কবি দেশপ্রেমিক রাজনীতিক। আল্লাহ্‌ তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন।

রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে প্রচারিত। এ'লান, জুন ১৯৫৩ প্রকাশিত। পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

বাঙ্গালী ফারসী কবি সূফী ফৎহ্ 'আলী (রঃ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং গত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যিনি উত্তর-ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ইহ-পরকালের মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন হয্‌রত শাহ্ সৈয়িদ আহ্‌মদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ)। যদি বালাকোটের যুদ্ধে রণজিৎ সিংহের সৈন্যবাহিনীর নিকট তাঁর মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত না হইত, তবে আমরা একশত বৎসর পূর্বেই পাকিস্তান হাসিল কবিতে পারিতাম। কিন্তু শহীদের খুন কখনও বৃথা যায় না। তাঁহার পরে তাঁর খলীফা মৌলানা কিরামত 'আলী জৌনপুরী, মৌলানা শাহ্ সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী প্রভৃতি বাংলাদেশ ও উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের নেতা পীর বীর শহীদের পন্থা অনুসরণ করিয়া ইস্‌লামের মৃতসঞ্জীবনী সুধাবাণী প্রচার করেন। মৌলানা সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী সাহেব ১২৬৫ বাংলা সনে এন্তেকাল করেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান খলীফা ছিলেন হয্‌রত মৌলানা শাহ্ সূফী ফৎহ্ 'আলী সাহেব।

তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পদচ্যুত নওয়াব ওয়াজেদ 'আলী শাহের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন, পরে পলিটিক্যাল পেন্‌শন অফিসের সুপারিনটেনডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। তার বিবাহ জিলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পুনাশী গ্রামে হয়। চাকরী-জীবনেই তিনি নিজের পীরের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লোকদিগকে মুরীদ (দীক্ষিত) করিতেন। তাঁহার কয়েকজন প্রধান খলীফা ছিলেন — হযর্‌রত শাহ সূফী মৌলানা মুহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী, হযরত শাহ সূফী মৌলানা গোলাম সল্‌মানী, হয্‌রত শাহ সূফী ইক্‌রামুল্ হক, শাসসুল 'উলামা মির্যা আশ্‌রফ 'আলী, হয্‌রত সৈয়িদ ওয়াজেদ আলী সাহেবান প্রভৃতি। পরে তিনি চাকরি ছাড়িয়া দীনের খিদমতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

হয্‌রত মুজদ্দিদ আল্‌ফসানী শয়খ আহ্‌মদ সরহিন্দী পর্যন্ত তাঁহার সিল্‌সিলা (পীর-পরম্পরা) নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। — হয্‌রত মুর্জদ্দিদ আলফসানী, তাঁহার খলীফা হয্‌রত আদম বনুনরী, তাঁহার খলীফা হয্‌রত সৈয়দ 'আবদুল্লাহ আকবরাবাদী, তাঁহার খলীফা মৌলানা শাহ্ ওলীয়ূল্লাহ, তাঁহার খলীফা মৌলানা শাহ্ 'আবদুল 'আযীয, তাঁহার খলীফা হযরত সৈয়িদ আহমদ শহীদ, তাঁহার খলীফা হযরত সূফী নূর মুহম্মদ নিযামপুরী, তাঁহার খলীফা হয্‌রত সূফী ফৎহ্ 'আলী (রহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা আজ্ মা'ঈন)।

তাঁহার পুত্র মৌলভী মুস্তফা 'আলী সাহেব তাঁহার অবসর গ্রহণের পর পোলিটিক্যাল পেনশন অফিসে তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। মৌঃ মুস্তফা 'আলী মরহুম সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌঃ মুহম্মদ মস্'উদুর রহমান এবং দ্বিতীয় পুত্র মৌলভী জানে 'আলম এম-এ, বি-এল বর্তমানে ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট।

হয্‌রত সূফী ফৎহ্ 'আলী সাহেব ১৩০৪ হিজরীর ৮ই রবী'উল আওওল তারিখ মোতাবেক ১২৯৩ সালের ২০শে অগ্রাহায়ণ (১৮৮৬ খ্রীঃ) রবিবার দিন এন্তেকাল করেন। তাঁহার মাযার কলিকাতার মানিকতলায়।

তিনি কেবল তরীকতের পীর ছিলেন না। তিনি ফারসী ভাষায় একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার তখল্লুস (কবি-নাম) ছিল ওয়সী। তাঁহার দীওয়ান-ই-ওয়সী তাঁহার দৌহিত্র মৌলভী সৈয়িদ মীর হাসান কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তক প্রকাশক হাজী মুহম্মদ 'আবদুল কয়্যুম কতৃক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাঁহার ১৭৯টি গযল এবং ২৩টি কসীদা আছে। যাঁহাদের ফারসী জানার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তাঁহারা মূল কবিতাগুলির রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইবেন। বাঙ্গালী পাঠকের জন্য আমি তাঁহার একটি মাত্র গযলের অনুবাদ দিতেছি। ইহার প্রথম দুইটি চরণ মহাকবি হাফিযের এক বিখ্যাত গযলের আরম্ভ বয়তের সহিত তুলনীয়। হাফিয বলিয়াছেন—

আগর আঁ তুর্কে শীরাযী ব-দস্ত আরিদ দিলে মারা
ব-খালে হিন্দুয়শ্ বখ্ শম্ সমরকন্দ্ ও বুখারারা।
(সেই শিরাযী তুর্কিবালা নেয় যদি মোর এ হিয়ারে,
তার এক তিলে বিলিয়ে দিব সমরকন্দ বুখারারে।)

আমাদের কবি বলেন—

আগর আঁ শাহে খূবানম্ নিহদ বর্ চশমে মন্ পারা
ব-খাকে পাএউ বখ্‌শম্ ম'আন্ দুন্‌ইয়া ও 'উক্‌বারা।

এখন সমস্ত গযলটির অনুবাদ শুনুন–

মোর যদি সে রূপের রাজা পা রাখে মোর আঁখির পরে,
বিলিয়ে দিব দীন্-দুনিয়া তার চরণের ধূলির তরে।

তার পীরিতি জ্বালায় নিতি পরাণ এমন বুকের মাঝে,
আগুন-পারা মোর হাহাকার দেয় গলায়ে পাষাণেরে।

হায় কি হ'ল রূপের রাজার? আমার দশায় নাই দয়া তাঁর।
মোর তবে কি রোদন দশার নাই খবর সেই রূপ-রাজেরে।

বারেক ব'লো, মলয় পবন! মোর কথা রূপ-সুলতানেরে—
তোমার বিনি দরশনে চাইনে আমি দুই চোখেরে।

এসো ওগো আহমদ নবী! এসো ওগো দয়ার ছবি!
নেক নজর দাও আমার দশায়, পা রাখ মোর আঁখির 'পরে।

নাই সখা মোর তোমা বিনে, নাই কো কোনও দিল-দরদী।
তুমি কিবলা, তুমিই গতি, তোমা বৈ কে দুঃখ হরে?

দরশনের আশে তোমার আঁখি হ'তে বহাই ধারা,
দোহাই খোদার, দাও এক নজর, খোল অন্ধ নয়নেরে।

ধিক্ আমাবি বদ নসীবের, শোক ছাড়া নাই ভাগ্যে কিছু,
পোড়ায় তোমাব বিচ্ছেদানল পাগলা আমার দিলখানারে।

এস ওগো ব্যথার ওষুধ, এস আমার আশার আলো,
দাও গো মলম জখম 'পরে, বর্ষাও চিনি লাল অধবে।

এস ওগো উজল জ্যোতি, এস উজল-দশন-জ্যোতি,
জ্যোতির তব কি উন্নতি! দেখাও সুঠাম ও-দেহেরে।

সে রূপ-রাজেব বন্দনাতে কিবা গযল গাইলে ওয়সী।
আশেক দিবে কাব্যে তোমার বিলিয়ে দীন ও দুনিয়ারে।*

হযরত শাহ সূফী ফৎহ 'আলী (রঃ) আধ্যাত্মিক শক্তি (কারামত) সম্পন্ন ছিলেন। তাহার একটি বৃত্তান্ত এখানে দিতেছি। ইহা সূফী সাহেবের প্রশিষ্য হযরত শাহ কসীমুদ্দীন (রঃ) সাহেবের জীবনীতে (পৃঃ ৪ — ৯) উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা তিনি তাঁহার মুরীদ ও জীবনীলেখক মৌলভী শাহ মুহাম্মদ নসীহতুল্লাহ মরহুম সাহেবের নিকট বর্ণনা করেন।

একবার সূফী ফৎহ 'আলী সাহেব ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তর বঙ্গের কমচিবাড়ীর নিকটবর্তী সুন্দরগঞ্জ হাটে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি শাহ কসীমুদ্দীনের পীর খোরাসান হইতে আগত হযরত মৌলানা শাহ সৈয়িদ মুহম্মদ কাসিম (রঃ) সাহেবের জনৈক মুরীদের বাড়ীতে কিছু কাল বাস করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক গুণাবলীর কথা ফুলের সৌরভের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন খোরাসানী পীর সাহেব কতিপয় মুরীদান সহ সুন্দরগঞ্জে তাঁহার যিয়ারতের জন্য আসেন। সূফী সাহেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র জাম্বিল হইতে কয়েকটি চাউল বাহির করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেন। তাহাতে তিনি আত্মহারা হইয়া মনে করেন যে তাঁহার অধিকতর আধ্যাত্মিক আলোক লাভ হইয়াছে। তাহাতে তিনি সূফী সাহেবের

* মাহেনও ॥ শ্রাবণ, ১৩৬০ জুলাই, ১৯৫৩ ॥

খিদ্‌মতে রহিয়া যান। একদিন সূফী সাহেব কয়েকজন মুরীদ সহ তাঁহাকে লইয়া তিস্তা নদীতে নৌকাভ্রমণ করিতে যান। তিনি নৌকায় ভ্রমণ কালে খোরাসানী পীর সাহেবকে বলেন, "হযরত, আমি যাই।" তাহাতে খোরাসানী বলেন, "হাঁ, যান।" তখন সূফী সাহেব ঝাঁপ দিয়া নদীবক্ষে দাঁড়াইলেন। আবার বলিলেন, " আমি যাই।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "যান"। এবার হাঁটু পর্যন্ত পানিতে ডুবিল। এইরূপে ক্রমে বুক, গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়া গেল। শেষ যখন বলিলেন, "আমি যাই" তখন "যান" বলার সঙ্গে সঙ্গেই সূফী সাহেব গভীর পানিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখিয়া খোরাসানী পীর সাহেবও নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নৌকাস্থিত লোকজন তাঁহাকে নিরস্ত করেন। অতঃপর তিনি তীরে উঠিয়া সূফী সাহেবের অন্বেষণে নদীর তীর দিয়া চলিতে থাকেন। কতক দূরে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, এক পাগলা ফকীর কতকগুলি ফুলের মালা গলায় দিয়া নদীতীরে বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে সূফী সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে পাগলা ফকীর বলিলেন, "কি ভাল হইত, যদি তুমিও তাঁহার সঙ্গে নদীতে ডুবিতে।" তখন খোরাসানী পীর সাহেব ব্যাকুলভাবে কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া দেখেন যে, ঐ পাগলা ফকীর আর সেখানে নাই। তখন তিনি মনে করিলেন যে, ঐ পাগলা ফকীর অবশ্য সূফী সাহেব হইবেন। অতঃপর তিনি সন্ধান করিতে করিতে ভুটানের এক পাহাড়ে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। সূফী সাহেব তাঁহাকে সলুক শিক্ষা দিয়া রংপুর, গাইবাঁধা প্রভৃতি অঞ্চলে লোকদিগকে হিদায়াত করিতে উপদেশ দেন।

হযরত শাহ সূফী ফৎহ 'আলী সাহেবের ওফাতের বৃত্তান্ত ফুরফুরার পীর সাহেব সাহেব কেবলার মুরীদ মৌঃ মোঃ আবদুল্ হালীম'আরামবাগী সাহেবের "ফুর্‌ফুরার পীর কেবলার জীবনী" (পৃঃ ৪৮—৫০) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "হয্‌রত দাদাপীর সাহেব কেবলা যেদিন এন্তেকাল ফরমান, তাহার পূর্বরাত্রে জনাব পীর ছাহেব কেবলা সমভিব্যাহারে হুগলী জেলার মোল্লা সিমলা গ্রামে জনৈক মোল্লার বাড়ীতে দাওয়াত উপলক্ষে অবস্থান করিতে ছিলেন। সেই সময় দাদা পীর ছাহেব কেবলা বলিয়াছিলেন যে, "তানফিরের ফয়েজ" আসিতেছে (অর্থাৎ দুনিয়া হইতে রুখছুত হইবেন বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন)। তৎপর পীর সাহেব কেবলাকে হুকুম করিয়াছিলেন, হয্‌রত শাহ হালব্বীর (রঃ) মাজার শরীফে জিয়ারত করিতে যাও। উক্ত হজরতের তরফ হইতে যাহা মা'লুম হয় আমাকে জানাইও। হুজুর কেবলা বলিয়াছিলেন — "উক্ত মাজার শরীফে বসিয়া আমার মা'লুম হইয়াছিল যে কাল মোল্লার বাড়ীতে আমাদের খাওয়া হইবে না, কিন্তু সাহস করিয়া এই কথা পীর ছাহেবের কর্ণগোচর করিতে পারিলাম না।" সেই রাত্রে দাদা পীর সাহেব কেবলা মোরাকাবায় বসিয়া সকলকেই ছবক জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু কাহাকেও তাওয়াজ্জুহ প্রদান করিলেন না; কেবলমাত্র হুজুর কেবলাকেই তাওয়াজ্জুহ্ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই তাওয়াজ্জুহই হুজুরের শেষ তাওয়াজ্জুহ। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দাদা পীর ছাহেব কেবলা বলিলেন— "একটি ফয়েজ বন্দ হইয়া গেল কেন?" পরক্ষণেই আবার তাঁহার চেহারা মোবারক উজ্জ্বলতর ধারণ করিল, তখন পুনরায় বলিলেন— "না ফয়েজ পুনরায় আসিয়াছে।" দুপুর

বেলায় দস্তরখানে খাওয়ার সামগ্রী প্রস্তুত, এমন সময় তিনি এস্তেঞ্জা করিয়া আসিয়া বলিলেন— "আছমান হইতে ব্যারাম আমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, জলদি ছল্‌ব (রুহানী শক্তিবলে সরাইয়া দেওয়া) কর।" হুজুর কেবলা ছল্‌ব করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ছল্‌ব হইতে ছিল না। হুজুর বলিয়াছেন যে— "তখন আমার কুওয়াতের ফয়েজের (রুহানী শক্তি) জোরও খুব বেশী ছিল, এত চেষ্টা করিতে লাগিলাম যেন আমি শূন্যে উঠিয়া যাইতেছি, তথাপি ব্যারাম ছল্‌ব হইতেছে না।" তৎপর তিনি ইশারায় জোহরের নামায আদায় করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার অর্দ্ধেক শরীর অবশ হইয়া গেল। হুজুর কেবলা তাঁহাকে লইয়া গাড়ীতে করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সেদিন মোল্লার বাড়ীতে তাঁহাদিগের আর খাওয়া হইল না। গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে যেমন পৌছিল, অম্‌নি দাদা পীর ছাহেব কেবলা হুজুর কেবলার কোলে মাথা রাখিয়া বাং ১২৯৩ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ, মোতাবেক হিঃ ১৩০৪ সালে ৮ই রবিউল আউয়াল রোজ রবিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় এন্তেকাল ফরমাইলেন। 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'

তাঁহার মাযার শরীফ কলিকাতা মানিকতলায় ২৪/১ মুন্‌শীপাড়া লেন দিল্লীওয়ালা কবরস্থানে বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক বছর ২৬শে রমযান দিন গতে রাত্রিতে সেখানে ঈসাল সওয়াবের জলসা হয়।

হযরত পীর ফৎহ্ আলী (রাঃ) সাহেবের কয়েকজন প্রধান খলিফার নাম

১। মৌলানা শাহ সূফী আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) ফুরফুরা। ২। মৌলানা 'আবদুল হক (রঃ), শিজগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। ৩। শাহ সূফী এক্‌রামুল হক (রঃ), পুনাসি, মুর্শিদাবাদ। ৪। মৌলানা গোলাম সাল্‌মানী (রঃ), ফুরফুরা। ৫। সূফী নেয়ায আহমদ (রঃ), কাৎড়া পোতা, বর্ধমান। ৬। শাহ দীদার বখ্‌শ (রঃ), পদ্মপুকুর, হাওড়া। ৭। শাহ বাকাউল্লাহ্ (রঃ), কানপুর, হুগলি। ৮। শেখ কোরবান (রঃ), বানিয়াতালাব, কলিকাতা। ৯। শামসুল 'উলামা মির্যা আশরফ 'আলী (রঃ), কলিকাতা। ১০। শাহ সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রঃ), মেহদী বাগ, কলিকাতা। ১১। মৌলভী সৈয়িদ যুলফকার আলী (রঃ), টিটাগড়, ২৪ পরগণা। ১২। মৌলভী 'আতাএ এলাহী (রঃ) মোগলকোট, বর্ধমান। ১৩। শাহ সূফী সুলয়মান (রঃ), বারাসাত, ২৪ পরগণা। ১৪। মৌলভী কাযী খোদা নওয়ায (রঃ), ধসা, হুগলি। ১৫। সূফী শয়খ লাল মুহম্মদ (রঃ), চুঁচুড়া, হুগলি। ১৬। মৌলভী সৈয়িদ ওবায়দুল্লাহ (রঃ), শান্তিপুর, নদীয়া। ১৭। হাফিয মুহম্মদ ইবরাহীম (রঃ), চট্টগ্রাম। ১৮। মৌলভী 'আবদুল 'আযীয (রঃ), চন্দোর, জাহানাবাদ, হুগলি। ১৯। মৌলভী আকবর আলী (রঃ), সিলহেট। ২০। হাফিজ মুহম্মদ ইবরাহীম (রঃ), ফুর্‌ফুরা, হুগলি; ইত্যাদি।

প্রমাণ পঞ্জী ১। হায়াতে ওয়সী — মওলানা জয়নুল আবিদীন আখতারী প্রণীত (১৯৫৫ ইং) ২। শাহ কছিম উদ্দীন (রঃ) সাহেবের জীবনী — মৌঃ শাহ মুহম্মদ নছিহত উল্লাহ প্রণীত [(১৩৫৫) মৌলভী মুহম্মদ মস'উদুর রহমান সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

প্রথম প্রকাশ ॥ মাহেলাও শ্রাবণ – ১৩৬০।

হযরত মৌলানা শাহ সূফী মুহম্মদ আবূবকর সিদ্দীকী (রঃ)

রসূলুল্লাহের (দঃ) শ্রেষ্ঠ সাহাবী এবং প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রাঃ) পবিত্র বংশে হযরত মৌলানা শাহ সূফী আবূ বকর সিদ্দিকী (রঃ) ১২৬৫ সালের ফাল্গুন মাসে হুগলি জিলার অন্তর্গত ফুরফুরা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ৩০তম উর্দ্ধ পুরুষ। তাঁহার ১৬শ অধস্তন পুরুষ হয্রত মন্সূর বাগদাদী (রঃ) ৭৪১ হিজরীতে ভারত-সম্রাট 'আলাউদ্দীন খিল্জীর রাজত্ব কালে বাগদাদ শরীফ হইতে ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলাদেশে আসিয়া হুগলি জিলার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া নামক গ্রামে বাস করেন। তাঁহার অধস্তন ৮ম পুরুষ হযরত মৌলানা হাজী মুস্তফা মদনী হযরত মুজদ্দিদ আল্ফসানীর (রঃ) তৃতীয় সাহেবযাদা হযরত মা'সূম রব্বানীর (রঃ) নিকট দিল্লীর জামে মসজিদে বয়'অত হ'ন। ঐ সঙ্গে বাদ্শাহ আওরঙ্গযেবও বয়'অত হন। হযরত মা'সূম রব্বানী (রঃ) কর্তৃক মৌলানা মুস্তফা মদনীকে (রঃ) লিখিত দুইখানি পত্র সারহিন্দ শরীফে সুরক্ষিত হস্তলিখিত মক্তুবাতে মাসূমিয়ায় লিখিত আছে। মৌলভী 'আবদুল হালীম আরামবাগী প্রণীত ফুর্ফুরার আ'লা হযরত পীর সাহেব কেবলার জীবনীতে এই দুইখানি পত্র (পৃঃ ১১ — ২৬) উদ্ধৃত হইয়াছে। মৌলানা মুস্তফা মদনীকে (রঃ) সম্রাট্ আওরঙ্গযেব বর্তমান মেদিনীপুর শহরে একটি মস্জিদ সমন্বিত মহল ও বহু লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন। এই মৌলানা মদনী নাম হইতে মদনীপুর নাম হয়, পরে তাহার অপভ্রংশে মেদিনীপুর হইয়াছে। বাদশাহী সনদের তারিখ ১০৭৭ হিঃ। ইহা ফুর্ফুরা শরীফের কেবলাহগাহ সাহেবের খান্দানে রক্ষিত আছে।

নবীএ করীম (দঃ) মাতৃগর্ভে এতীম হন, আর আমাদের কেবলা গাহ্ পীর সাহেবের নয়মাস বয়সে তাঁহার ওয়ালেদ মৌলানা আল্হাজ্জ 'আবদুল মুক্তাদির সাহেব ১২৬৬ সালে কার্তিক মাসে এন্তেকাল করেন। অতঃপর তাঁহার স্নেহময়ী জননী মুসাম্মাত মুহব্বতুন্নিসা বিবি সাহেবা তাঁহাকে অতিশয় যত্নসহকারে লালন পালন করেন।

পীর সাহেব কিবলা প্রথমে সীতাপুর মাদ্রাসায়, তৎপরে হুগলি মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। তিনি পাঠ্যাবস্থায় সকল পরীক্ষাতেই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় হুগলী মুহসিনিয়া বোর্ডিংে থাকাকালে তিনি সময় সময় রাত্রিকালে বাহির হইয়া যিকর

করিতে করিতে সমস্ত গলি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি বলিয়াছেন যে সেই সময় একটি নূর তাঁহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত ঘিরিয়া রাখিত। তখন তিনি যিকরে মত্ত হইয়া যাইতেন এবং জয্‌বার দশায় পতিত হইতেন। মোট কথা ছাত্র-জীবনেই তাঁহাতে ওলীর লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি লোকদিগকে রোগ মুক্তির জন্য তেল পানি দম করিয়া দিতেন, তাহাতে অনেকেই ফায়দা পাইত।

তিনি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ পরীক্ষা জমা'আতে 'উলা পাশ করিয়া মাদ্রাসা ত্যাগ করেন। অতঃপর কলিকাতায় যাইয়া তিনি হযরত মৌলানা হাফিয জামালুদ্দীন সাহেবের (রঃ) নিকট সিন্দুরিয়া পট্টির এক মসজিদে হাদীস, তফসীর এবং ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। ইনি বিখ্যাত হযরত সৈয়িদ আহমদ শহীদ বেরলভীর (রঃ) এক প্রধান খলীফা ছিলেন।

অতঃপর তিনি সিন্দুরিয়া পট্টির না-খোদা মস্‌জিদে হয্‌রত মৌলানা বেলায়তি (রঃ) সাহেবের নিকট মন্তিক, হিক্‌মত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। এই রূপে তিনি ২৩/২৪ বৎসর বয়সেই বিবিধ ধর্মবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহার পর তিনি কিছুদিন মদীনা শরীফে পড়িয়া চল্লিশটি হদীসের কিতাবের সনদ লাভ করেন। তাঁহার জীবনীতে ঐ সমস্ত কেতাবের তালিকা দেয়া হইয়াছে।

বাহ্য বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিঁনি আধ্যাত্মিক বিদ্যা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তখন কলিকাতায় হযরত শাহ্ সূফী ফৎহ্ 'আলী সাহেব (রঃ) বিদ্যমান ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট বয়'অত হইয়া পরে তাঁহার একজন প্রধান খলীফা হন।

ইল্‌মে যাহিরী ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ইল্‌মে লদুন্নীও প্রদান করিয়াছিলেন। এক দিবস হয্‌রত পীর সাহেব কিব্‌লা (রঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, হয্‌রত নবীএ করীম (দঃ) আগে আগে যাইতেছেন আর তিনি তাঁহার পিছনে পিছনে মস্‌আলাসমূহ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইতেছেন এবং তাঁ হযরত তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন।

হয্‌রত পীর সাহেব কিব্‌লার (রাঃ) আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমি এখানে একজন নিরপেক্ষ 'আলিমের বর্ণনা পেশ করিতেছি। হয্‌রত মৌলানা আশ্‌রফ 'আলী থানবী (রাঃ) সাহেবের জীবনী আশরাফুস সওয়ানিহ্ পুস্তকে (৩য় খণ্ড ৯৪ পৃঃ) লিখিত আছে যে, মৌলানা আমীর হোসেন (মাদ্রাসা সাহারানপুরী) বলেন, (উর্দু হইতে অনুবাদ)—

"একদা আমি স্বপ্নে দেখি একটা জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সভাপতি হয্‌রত নবী করীম (দঃ) হইয়াছেন। সভা শেষে লোকেরা বিভিন্ন প্রকারের মস্‌আলা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এ গোলামও সুযোগ বুঝিয়া হয্‌রতকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিল যে হয্‌রত হকীমুল উম্মত মৌলানা থানভী সাহেব এবং মৌলানা আবূ বকর ফুরফুরাভী সাহেব ইঁহারা কেমন লোক এবং ইঁহারা যাহা কিছু বলেন তাহা শরী'অত অনুযায়ী কি না। তদুত্তরে হয্‌রত নবী করীম (দঃ) ফরমাইলেন, উভয়ই নেক ব্যক্তি এবং ইঁহারা যাহা কিছু বলেন এবং লিখেন, সে সমস্ত বিল্‌কুল হক।"

হয্‌রত পীর সাহেব কেবলা (রঃ) সম্বন্ধে স্বপ্নযোগে হয্‌রত নবী করীমের (দঃ) বহু উক্তি এবং তাঁহার বহু কারামতের বৃত্তান্ত তাঁহার জীবনীতে লিখিত আছে। আমি এখানে আমার জানা তাঁহার দুইটি কারামতের বিষয় উল্লেখ করিব। ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের ভূতপূর্ব কর্মচারী মৌলভী 'আবদুস্ সামাদ সাহেব আমাকে বলেন যে, তিনি এক সময়ে পেটের ক্ষত (gastric ulcer) রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পান। ঢাকার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে গিয়া অস্ত্র উপচার করিতে পরামর্শ দেন। তিনি কলিকাতায় গিয়া হযরত পীর সাহেবের (রঃ) সাক্ষাৎ করেন। পীর সাহেব তাঁহাকে তেল পড়িয়া দিয়া পেটের বেদনার স্থলে লাগাইতে বলেন। তাহাতে তিনি কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। ঢাকায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহার অস্ত্র উপচারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, বিনা অস্ত্র চিকিৎসায় যে তিনি নীরোগ হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া যান। তাঁহারা ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতেই চাহেন নাই।

আর একটি ঘটনা এই। আমাকে একজন ধুবড়ীবাসী মুসলমান এই বৃত্তান্ত বলেন। ধুবড়ী শহরে নদীর ভাঙ্গনে তীরস্থিত ঘড়বাড়ী, দোকানপাট ধ্বংস হইবার আশঙ্কা হয়। তখন তিনি এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য পীর সাহেবের শরণাপন্ন হন। পীর সাহেব কয়েকট বড় বড় শিকের উপর দো'আ পড়িয়া নদীর কিনারায় পুঁতিয়া দিতে বলেন। সেইরূপ করা হইলে নদী সরিয়া যায় এবং ভাঙ্গন বন্ধ হইয়া যায়।

পীর সাহেব কেবলা দুইবার হজ্জ সম্পাদন করেন — সন ১৩১০ এবং ১৩৩০ সালে। এই দ্বিতীয় হজ্জের সময় তাঁহার প্রায় তেরশত মুরীদ ও ভক্ত সঙ্গে গিয়াছিলেন। প্রথম হজ্জের সময় স্বপ্নে রসূলে মকবুলের (দঃ) দীদার হাসিল করেন। তাঁহার দর্শনে তিনি মুহব্বতে আত্মহারা হইয়া বলেন, হযরত, আমার নাম 'আবদুর্ রসূল রাখুন। আঁ হয্‌রত (দঃ) ঈষৎ হাস্য করিয়া ফরমাইলেন, "না, আমি তোমার নাম 'আবদুল্লাহ রাখিলাম।" সেই হইতে পীর সাহেব নিজের নামের পূর্বে অনেক সময় 'আবদুল্লাহ্ লিখিতেন। দ্বিতীয়বাব মক্কা মু'আয্‌যমার হজ্জ সম্পাদন করিয়া তিনি মদীনা শরীফে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণের নিকট হদীস শরীফ অধ্যয়ন করিয়া সনদ লাভ করেন।

এই সময়ে তিনি কলিকাতা বেলিয়াঘাটার জমিদার বিবি সওলতুন্নিসার প্রতিষ্ঠিত মক্কাস্থিত মাদ্রাসাএ সওলাতিয়া পরিদর্শন করিয়া এক হাজার টাকা দান করেন। এই বিবি সাহেবা তাঁহার আত্মীয়া ছিলেন। তিনি আমার ওয়ালিদারও সাক্ষাৎ খালা ছিলেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি।

লোকদিগকে আল্লাহর ওয়াস্তে হিদায়ত করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এই জন্য তিনি জমী'অতে ওলামাএ বাঙ্গালা ও আসাম নামে একটি 'উলামা সমিতি এবং আঞ্জুমনে ওয়াএযিনে বাঙ্গালা নামে একটি ইস্‌লাম প্রচার সমিতি স্থাপন করেন এবং আঞ্জুমনে ওলামাএ বাঙ্গালার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত সমিতির মুখপত্র

ছিল আল এছলাম। ইহাতে বহু মনীষী ইসলাম সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই অধম লেখকেরও কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা তাহাতে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা সম্বন্ধে মাহে নও পত্রিকায় আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ইস্‌লাম প্রচারের জন্য বিবিধ মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

পীর সাহেব কেবলা তাঁহার এন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক বছর প্রধানতঃ বাঙ্গলা ও আসামের বহু স্থানে ধর্মসভায় মর্মস্পর্শী ওয়ায নসীহত করিয়াছেন। তাহাতে বহু লোক ধর্মজীবন লাভ করিয়াছে এবং মুরীদ হইয়াছে। ১৩৪১ সালের ২৬শে আশ্বিন, ১৯৩৪ ইং সনের ১৩ই অক্টোবর তিনি হিন্দুস্তান সফরে যান। প্রায় একশত মুরীদ ও ভক্ত তাঁহার সহযাত্রী ছিল। তন্মধ্যে এই অধম লেখকও ছিল। তাঁহার জন্য রিজার্ভ কামরা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের সঙ্গে থার্ড ক্লাসের আরোহী ছিলেন। আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল দিল্লী। তিনি সমস্ত পথ বিনিদ্র থাকিয়া আমাদিগকে নানা নসীহত করিতেছিলেন, অথচ আমরা ঘুমে কাতর হইয়া পড়িতেছিলাম।

আমরা হুযুর কেবলার সহিত দিল্লী পৌছিয়া হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফসানী (রঃ) সাহেবের পীর হয্‌রত বাকীবিল্লাহ (রঃ) হয্‌রত কুতুবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকী (রঃ), হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রঃ) সাহেবানের এবং অন্যান্য বোযর্গানের মাযার যিয়ারত করি। চারিদিন পরে আমরা হুযুর কেবলার সহিত আজমীর শরীফে যাত্রা করি। সেখানে দুই দিন থাকিয়া হুযুর কেবলা খাজা সাহেবের দরগাহে যে সমস্ত শির্ক ও বিদ্‌আত কাজ হয়, তাহার বিরুদ্ধে ওয়ায করেন এবং দান খয়রাত করেন। আজমীর শরীফ হইতে আমরা হুযুর কেবলার সহিত সারহিন্দ শরীফে রওয়ানা হই। সেখানে ১০/১২ দিন তিনি ওয়ায নসীহত করিয়া কাটান এবং দান খয়রাত করেন। বিদায় দিনে সেখানকার মুতাওল্লী সাহেব তাঁহাকে কিছু উপহার দিয়া বলেন, আমি হয্‌রত মুজাদ্দিদ সাহেবের তরফ হইতে এই সমুদয় তোহফা হুযুরকে দিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আরও ইহা জানিতে পারিয়াছি যে আপনি এই যমানার মুজাদ্দিদ। এই বলিয়া তিনি উল্লাসের সহিত হুযুরের মাথায় মুজাদ্দিদী টুপী পরাইয়া দিলেন। সারহিন্দ শরীফ হইতে আমরা কলিকাতায় চলিয়া আসি। এই সফরের বৃত্তান্ত হুযুর কেবলার জীবনীতে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। এই সফরের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ আমার একটি গেরুয়া রঙ্গের লম্বা কুর্তা এবং তারাগড়ের হাদিয়া একটি পাগড়ী বর্তমান আছে।

হুযুর কেবলা কেবল লোকদিগকে হিদায়ত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্‌যোগে অনেক স্থানে অনেক মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। ফুর্‌ফুরা শরীফেও একটি ওল্ডস্কীম মাদ্রাসা* এবং একটি নিউস্কীম হাই মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। তিনি যে ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, এই নিউস্কীম মাদ্রাসা তাহার হাতে কলমে প্রমাণ দিতেছে। আমি তাঁহাকে অনেক ধর্ম সভায় বলিতে শুনিয়াছি যে ইংরেজী বিদ্যা একটি হুনর। তাহা শিখিতে কোনও দোষ নাই। কিন্তু খবরদার! তোমরা দীনী ইল্‌ম ছাড়িয়া তাহা শিখিবে না। তিনি আরও বলিতেন যে আঁ হয্‌রত

(দঃ) স্বীয় সাহাবী হয্‌রত যয়দ্ ইবন্ সাবিতকে (রাঃ) প্রয়োজনের খাতিরে হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি অল্প দিনের মধ্যে সেই ভাষা শিখিয়া রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর তরফ হইতে য়িহুদীদিগকে হিব্রুভাষায় পত্রাদি লিখিতেন।

তিনি রাজনীতিক ছিলেন না। কিন্তু আবশ্যক বোধে রাজনীতিতেও যোগ দিতেন। তিনি মুসলিম লীগের এক সভা উপলক্ষে একবার ঢাকায় তশ্‌রীফ আনিয়া আমার তদানীন্তন গরীবখানায় (বর্তমান মেডিকেল কলেজের উত্তর গেট হাউসে) অবস্থান করেন। এই সভা শাহবাগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সভায় ইসলাম বহির্ভূত বলিয়া হাততালি দিতে জোরের সহিত নিষেধ করেন। তিনি বলেন, "তোমরা হাত তালির পরিবর্তে 'মর্‌হবা' বলিবে।" তাঁহার উপদেশ সকলে শিরোধার্য করিয়া লয়।

মসজিদের সম্মুখে বাজনা লইয়া কলিকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তাহাতে তিনি মসজিদ মাত্রেরই নিকটে যাহাতে বাদ্য বাজান না হয়, তজ্জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানান। এই উপলক্ষে তিনি তদানীন্তন গভর্ণরের আহূত সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আজও পাকিস্তান ও ভারত সরকারের বিবেচনার উপযুক্ত। তিনি শয়খ সা'দীর কবিতা—

রা'য়ত চূ' বেখ-ন্দ সুলতাঁ দরখ্‌ত।
দরখ্‌ত আয় পিসর বাশদ আয বেখ সখ্‌ত ॥

(রায়ত যেমন শিকড় এবং বাদ্‌শাহ গাছ। হে পুত্র, বৃক্ষ শিকড়ের জোরেই শক্ত থাকে।) —

আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইংরেজ রাজত্ব একটি বৃক্ষস্বরূপ। সেই বৃক্ষের তিনটি শিকড়। যথা— হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান। বৃক্ষটিকে রক্ষা করিতে হইলে এই তিন জাতিরই ন্যায্য দাবীসমূহ সমান অংশে পূরণ করিয়া শিকড় তিনটি মজবুত রাখিতে হইবে। অন্যথায় বৃক্ষ স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না।" ফলে ছোট বড় সকল মস্‌জিদের সামনে বাদ্য বাজান সরকার হইতে নিষিদ্ধ হয়।

তিনি ইস্‌লাম বিরোধী বলিয়া সারদা বিল এবং ওয়াক্‌ফ বিল সম্বন্ধেও ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "শরী'অত বিরুদ্ধ যাহাই হউক না কেন, আমি নিশ্চয়ই তাহার প্রতিবাদ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইব না। আবূ বকর আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ভয় করে না।"

১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন মুসলমান সমাজের জন্য ক্ষতিকর হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি তাহার বিরোধিতা করেন। মিঃ সি. আর. দাস, গান্ধীজী এবং মৌলানা মুহম্মদ আলী প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেও তিনি এই আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। তিনি মৌলানা সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "আমাদের মনে রাখা উচিত, আমরা প্রথমে মুসলমান, তারপর আমরা ভারতবাসী।"

তিনি বলকান যুদ্ধকালে তুরস্কের দুঃস্থদের সাহায্যার্থে অনুমান ৬০ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করেন। ১৩২৬ সালে আশ্বিনের ঝড়ে বাঙ্গালাদেশের বিপন্নদের সাহায্যের জন্য তিনি অনুমান ৫০ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া

পাঠাইয়া-ছিলেন।

হুযুর কেবলার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য ১৯০৬–৮ সালে হুগলী মুহসিনিয়া বোর্ডিঙে আমার অবস্থিতির সময় ঘটে। তখন আমি হুগলী কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র। বোর্ডিঙে তাঁহার এক আত্মীয় থাকিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য বোর্ডিঙে আসিতেন। আমরা ছাত্রেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতাম, তিনি তাহার সদুত্তর দিতেন। নিতান্ত বেয়াড়া প্রশ্নেও তিনি কখনও বিরক্ত হইতেন না।

পাটনায় ৬ষ্ঠ সর্বভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনে (All-India Oriental Conference) যোগ দিয়া যখন আমার কর্মস্থল ঢাকায় ফিরিবার পথে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলাম (বোধ হয় ১৯৩১ সালে কিংবা ১৯৩২ জানুয়ারী), তখন চাঁদনি চকের টিকিয়াটুলির মস্‌জিদে মগ্‌রিবের নমায অন্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে হুযুরে কিবলার সহিত মোলাকাত হয় এবং আমি তাঁহার দস্ত-মুবারকে বয'অত হই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে আমার ওয়ালিদ মরহূম মুনশী মফীযুদ্দীন আহমদ সাহেব তাঁহার নিকট তাল্‌কীন ছিলেন। হুযুরের সেই সময় খুবই কম সংখ্যক মুরীদান ছিলেন। এই কারণে তিনি আমাকে সবিশেষ স্নেহ করিতেন।

১৯২৮ সালে ফরীদপুর শহরের এক বিরাট ধর্মসভায় হুযুর কেবলা সহসা আমাকে কুর্‌আন মজীদের বাংলা অনুবাদ করিতে আদেশ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা এবং অন্যান্য নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকায় হুযুরের আদেশ স্মরণ থাকিলেও বহু দিন তাহা পালন করিতে পারি নাই। খোদার মরযী আমি ৪/৯/৪০ইং তারিখ হইতে প্রায প্রত্যহ বা-ওযু অল্প অল্প তর্জমা করিতে করিতে ২৪/৭/৪৯ ইং তারিখে বগুড়ার জামে মসজিদে 'ইতিকাফের অবস্থায় ২৭শে রমযানে তাহা শেষ করি। কলিকাতার জাগরণ মাসিক পত্রিকা এবং ঢাকার যুববাণী মাসিক পত্রিকায় তাহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। আশা করি শীঘ্রই তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে। (ইন্‌শাআল্লাহ্)।

হুযুর কেবলা প্রত্যেক বৎসর ফুর্‌ফুরা শরীফে ফাল্গুন মাসের ২১, ২২, ২৩ তারিখে ঈসালে সওয়াবের নিয়ম করিয়াছেন। তাহাতে কয়েক সহস্র লোকের খাওয়া পেওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত করা হয় এবং ওয়ায, খত্‌মে কুর্‌আন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই ঈসালে সওয়াব উপলক্ষে অসংখ্য লোক তাঁহার প্রাণস্পর্শী ভাষণ শুনিয়া মুগ্ধ হইত। অনেকেই তাঁহার নিকট মুরীদ হইত। বিভিন্ন স্থানে তাঁহার ধর্মীয় বক্তৃতার ফলে কয়েকজন হিন্দু তাঁহার নিকট ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম জিলার নওয়াপাড়া নিবাসী বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন একজন। তিনি ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া আবদুল মু'মিন নাম ধারণ করেন। তিনি পরে একজন ওলীএ কামিল হন।

হুযুর কেবলার আদেশে আমাকে অনেক সভায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। তিনি আমার বক্তৃতা পছন্দ করিতেন ও আমার জন্য দো'আ করিতেন এবং উপস্থিত সকলকে আমার জন্য দো'আ করিতে বলিতেন। একটি সভার কথা বিশেষ স্মরণীয়।

পীর সাহেব কেবলার সভাপতিত্বে কলিকাতার হাল্‌দার লেনে এক শবে বরাতের সময় একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মিষ্টার শহীদ সোহ্‌রাওর্দী তন্মধ্যে একজন ছিলেন। আমার বক্তৃতায় হুযুর কেবলা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। আমি বিশ্বাস করি হুযুরের তওয়াজ্জুহ্ আমার সফলতার কারণ ছিল।

ঢাকা জিলার জিনারদিতে এক সভা হয়। সেই সভা উপলক্ষে ঢাকায় আসিয়া তিনি সলীমুল্লাহ মুসলিম হলে আমার তদানীন্তন আবাসে তশরীফ রাখেন। সেই সভার পরদিন ২৪শে সফর, ১৩৫৫ হিঃ, (১৬ই মে, ১৯৩৬) তারিখে তিনি অযাচিতভাবে এই নরাধমকে খিলাফতনামা এনায়ত করেন।

তাহাতে লিখিত আছে —

برائے توبہ کنانیدن وبیعت کردن و وعظ کفتن
وتعلیم کردن اجازت داده شد - محمد ابو بکر -

— তওবা করাইতে ও বয়আত করিতে ও ওয়ায করিতে তা'লীম দিতে অনুমতি দেওয়া হইল।— মুহম্মদ আবূ বকর

পূর্বে ফুর্‌ফুরার এক ঈসালে সওয়াবের মহতী সভায় তিনি এই অধমকে মৌলানা খেতাব দান করেন। এই জন্য খিলাফত নামায় مولانا ڈاکٹر محمد شهيد الله صاحب - —নাম লিখা হইয়াছে।

হুযুর কেবলার অন্যান্য প্রধান খলীফাগণ, যত দূর আমার জানা আছে, হইতেছেন—

১। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলানা শাহ্ সূফী আলহাজ্জ আবু নসর 'আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব (১৯৭৭ সালের ১৩ই মে কলকাতায় ইন্তেকাল করেন)।
২। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র 'আল্লামা শাহ্ সূফী আলহাজ্জ আবূ জা'ফর মুহম্মদ ওজীহুদ্দীন মুস্তফা সিদ্দীকী সাহেব। (৯৬)
৩। মৌলানা শাহ্ সূফী তজম্মুল হুসয়ন সিদ্দিকী সাহেব (রঃ)।
৪। শাহ্ সূফী সদরদ্দীন সাহেব (রঃ)।
৫। মৌলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন সাহেব (রঃ)।
৬। মৌলানা শাহ্ সূফী রূহুল আমীন সাহেব (রঃ)
৭। খান বাহাদুর মৌলানা আলহাজ্জ আহমদ 'আলী এনায়েতপুরী সাহেব (রঃ)।
৮। অধ্যাপক মৌলানা 'আবদুল খালিক এম, এ, (রঃ)।
৯। মৌলানা সৈয়িদ হাতিম আলী সাহেব (রহ.) বাগদাদী।
১০। মৌলানা তুফায়েল আহমদ সাহেব।
১১। মৌলানা হাফিয হাজী সৈয়িদ আ. ব. ম. বশীরুদ্দীন সাহেব(রহ.)।
১২। মৌলানা আহমদ 'আলী হামিদ জালালী (রঃ)।
১৩। সূফী মুহম্মদ শফী (রহ.) সাহেব, কলিকাতা।
১৪। সূফী 'আবদুস্ সত্তার সাহেব (রহ.), M. A. ঢাকা; ইত্যাদি।

অনেক উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি হুযুর কেবলার মুরীদ ছিলেন ও আছেন। তন্মধ্যে আমি যাঁহাদিগকে জানি, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি —

১। খান বাহাদুর 'আবদুল হালীম চৌধুরী (রহ.), অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।

২। মৌলভী মুহম্মদ 'আবদুল্লাহ, (রহ.) অবসরপ্রাপ্ত আবকারী সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট।

৩। মৌলভী 'আবদুল 'আযীয, অবসরপ্রাপ্ত, সহকারী ইন্‌কামট্যাক্স কমিশনার।

৪। মৌলভী আবু 'ঈসা মুহম্মদ মসীহা (রহ.), অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটি ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীয, পূর্ব পাকিস্তান।

৫। মৌলানা ফযলুল করীম (রহ.), এম-এ; বি-এল; অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ।

৬। অধ্যাপক সৈয়দ আ. ক. ম. জালালুদ্দীন (রহ.) এম-এ.।

৭। মৌঃ সৈয়িদ আ. ন. ম. নসীরুদ্দীন (রহ.), এম-এ; বি-এল. অ্যাডভোকেট।

৮। মৌঃ আ. হ. ফারুক আহমদ, এম-এ, চট্টগ্রাম।

৯। মৌঃ আ. য. জলীল আহমদ, এম. এ. (রহ.), বগুড়া।

১০। মৌঃ 'আবদুস সাত্তার (রহ.), সহকারী ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার।

১১। মৌঃ সৈয়িদ আ. য. ম. যহীরুদ্দীন (রহ.), পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট।

১২। মরহুম আবু মুজ্‌তবা মুহম্মদ মূসা (রহ.), (সরকারী উকিল, কুমিল্লা)।

১৩। " সৈয়িদ 'মঈনুদ্দীন আহমদ (রহ.), পুলিশ ট্রেনিং স্কুল, কলিকাতা।

১৪। " খান বাহাদুর 'আবদুর্ রহমান (রহ.) (অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী)।

১৫। " খান সাহিব 'আবদুল কাদির (রহ.) (ডেপুটি জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট) ইত্যাদি। (যাঁহাদের নাম দিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। জানাইলে তাঁহাদের নাম পরে যোগ হইতে পারে)।

"কুল্লু নফ্‌সিন্ যা'ইকতুল মওত"— প্রত্যেক জীব মৃত্যু আস্বাদনকারী— কুর্‌আন শরীফের এই অব্যর্থ মহাবাণী অনুসারে মুজাদ্দিতে যমান আমীরে শরী'অত হয্‌রত পীর সাহেব কিবলার (রঃ) পাক রূহ তাঁহার মুরীদ, মু'তাকিদ ও আত্মীয় পরিজনদিগকে অতল শোকসাগরে ডুবাইয়া ২৫শে মুহররম, ১৩৫৮ হিঃ, ৩রা চৈত্র ১৩৪৫ সাল, ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩৯ ইং শুক্রবার সুব্‌হ সাদিকের ৫-৪৫ মিনিটের সময় যিক্‌রে এলাহীর পাস্-আনফাসের সহিত দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া মহবূবে হকীকীর দীদারের জন্য উর্ধ্বলোকে মহাপ্রয়াণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলায়হি রাজি'উন। পরদিন শনিবার ৫টার পর প্রায় অর্ধ লক্ষ লোক তাঁহার জানাযায় শরীক হয়। তাঁহাকে পারিবারিক গোরস্তানে মদফুন করা হয়। শত আফসোস! এই অধম ঢাকায় থাকায় জানাযায় শরীক হইতে অক্ষম হয়। আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্‌লি হায়্যিনা ও মায়্যিতিনা ও শাহিদিনা ও গায়িবিনা ও যকারিনা ও উন্‌সাইনা। আল্লাহুম্মা মন্ আহ্‌য়ায়তাহু মিন্না

ফ-আহ্য়াহু 'আলাল ইসলাম ও মন তওফ ফযতাহু মিন্না ফ-তওফফহু 'আলাল ঈমান।

তাঁহার ওফাত আমাদের জন্য চির শোকাবহ হইলেও তাঁহার জন্য ছিল আনন্দময়—

খুর্রম আঁ রোয কযী মন্‌যিলে ওয়রাঁ বি-রওম।
রাহতে জাঁ তলবম ও আয পএ জানাঁ বি-রওম॥

(হাফিয)

সুখের সে দিন যে দিন বিজন প্রবাস হইতে চলিব,
পাইব আরাম পরাণ-বঁধুরে নিবিড়ে পাইতে চলিব।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী (অনুবাদ) —

"হে প্রশান্ত আত্মা তোমার প্রতিপালক
প্রভুর দিকে ফিরিয়া চল, তুমি
সন্তুষ্ট, তিনিও সন্তুষ্ট। অতঃপর
আমার দাসগণের
মধ্যে দাখিল হও,
আর আমার জন্নাতে দাখিল হও।"*

(কুর্‌আন, সূরা ঃ ফজর)

তাম্মাৎ বিল খয়র — শুভ সমাপ্তি।